দস্যু রাণীর কবলে দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

দস্যু রাণীর কবলে দস্যু বনহুর-৭৪

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ [illegible]বাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

তোমার অনুমান মিথ্যা নয় বন্ধু, আমিই সেই যার জন্য তোমার ভাগ্যাকাশে বারবার দুর্যোগের ঘনঘটা ঘনিয়ে এসেছে, অনেক কষ্ট ভোগ করেছো। এ জন্য আমি অপরাধী। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থামলো আওরঙ্গবেশী দস্যু বনহুর।

প্রদীপ কুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো দস্যু বনহুরের মুখের দিকে, সে ঐ মুখখানাকে ভাল করে দেখতে চাইলো। কিন্তু একমুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা সেই মুখখানা। বললো এবার প্রদীপ কুমার—জানতাম তুমি আমাকে একদিন না একদিন উদ্ধার করবে। তোমার প্রতীক্ষায় আমি প্রহর গুণতাম বন্ধু।

বনহুর একটু হাসলো।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর উঠে দাঁড়ালো বনহুর, বললো— এবার চলো বন্ধু, উঠতে হবে।

প্রদীপ কুমার আর দস্যু বনহুর সম্মুখে এগুতে লাগলো।

উচুনীচু পাহাড়িয়া পথে দু'জন এগিয়ে চলেছে।

বনহুর ইচ্ছা করেই আওরঙ্গের ছদ্মবেশ ত্যাগ করেনি, কারণ উভয়ের চেহারা এক হওয়ায় দ্বিধা এলো মনে। মন্থনা রাজ্যের জনগণ রাজকুমার প্রদীপকে ভালভাবেই চেনে, কাজেই তারা যেন দু'জনকে একই রকম দেখে চমকে না যায় বা নতুন কোনো বিভ্রাট না ঘটে।

এদিকে কারাগারে নিজেদের সঙ্গীদের বন্দী অবস্থায় দেখে দস্যু রাণীর অন্যান্য অনুচর বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো, তারা ছুটলো চন্দনার কাছে।

চন্দনা সবেমাত্র সুখনিদ্রা ত্যাগ করে উঠতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো দু'জন অনুচর।

একজন ব্যস্তকণ্ঠে বললো—চন্দনা দিদি, সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ হয়ে গেছে...

চন্দনা চোখ রগড়ে বিস্মিতকণ্ঠে বললো—সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?

ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বললো আর একজন।

চন্দনা রাগতঃ কণ্ঠে বললো—কি হয়েছে বলো না?

দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

চন্দনা লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—বলো, কি, দস্যু বনহুর পালিয়েছে!

হাঁ চন্দনা দিদি! চলো দেখবে চলো, দস্যু বনহুর মদন আর বন্দী শালার প্রহরীদ্বয়কে কারাকক্ষে বন্দী করে রেখে পালিয়েছে।

বলো কি?

সত্যি চন্দনা দিদি, গিয়ে দেখ।

চন্দনা অনুচরদের সঙ্গে রওনা দিলো কারাকক্ষের দিকে।

কারাকক্ষে বন্দী পৌঁছে চন্দনার চক্ষুস্থির। মদন এবং দু'জন প্রহরী কারাকক্ষে বন্দী অবস্থায় হা করে দাঁড়িয়ে আছে। এক এক জনের মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

চন্দনা বলে উঠে—কি করে তোমরা কারাকক্ষে গেলে, বলো?

মদন বললো—আগে আমাদের কারাকক্ষ থেকে বের করে নাও, সব বলছি।

চন্দনা বললো—না না মুক্তি নয়, ঐ বন্দীশালায় থেকেই সব বলতে হবে। কেমন করে তোমরা বন্দীশালায় প্রবেশ করলে আর বন্দী কি করে বন্দীশালা থেকে পালালো?

মদন প্রায় কেঁদে ফেললো—চন্দনা দিদি, আমার কোনো দোষ নেই, ঐ আওরঙ্গের যত দোষ......

চমকে উঠলো চন্দনা—আওরঙ্গ! কোথায় সেই বৃদ্ধ?

মদন বলে উঠে— ঐ আওরঙ্গই তো আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো বন্দীশালায়। আমি কি তখন জানতাম সে এমন সর্বনাশ করবে। চন্দনা দিদি, তোমাকে কি বলবো সে কথা!

চন্দনা ক্রুদ্ধ বিস্মিত, চিৎকার করে বললো—কোথায় সেই আওরঙ্গ?কি বলছো তুমি মদন, খোলাসা করে বলো?

মদন আওরঙ্গের সঙ্গে এখানে আসার পর যে ঘটনা ঘটেছিলো, সব খোলাসা চন্দনার কাছে বললো। চন্দনার চোখ দুটো যেন ছানাবড়া হয়ে গেছে। সহসা তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। নিজকে সামলে

নিয়ে বললো চন্দনা—আওরঙ্গ! আওরঙ্গের শরীরে এতো শক্তি! সে তাহলে ন্যাকামি করে দুর্বল সেজে থাকতো?

মদন বললো—হাঁ চন্দনা দিদি, বুড়ো হলে কি হবে, আওরঙ্গ ভীষণ শক্তিশালী।

চন্দনা বললো—সে যে শক্তিশালী সে কথা কেমন করে বুঝলে? সে তোমাদেরকে অস্ত্র দ্বারা কাবু করে ফেলেছিলো?

না চন্দনা দিদি, লোকটার কথাবার্তায় তার দেহ যে শক্তিশালী তা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো। তুমি যা মনে করছো আসলে তা নয়। আওরঙ্গ জোয়ারের চেয়েও শক্তিবান।

চন্দনা তখন ভাবছে, আওরঙ্গকে সে-ই নিয়ে এসেছিলো শাহান শাহ জাহাজ থেকে। আওরঙ্গকে সে বিশ্বাস করেছিলো একান্তভাবে। এভাবে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। কিন্তু এমন শক্তিহীন এক বৃদ্ধ যে এমনভাবে সর্বনাশ করবে ভাবতে পারেনি সে কোনো সময়। চন্দনা নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো। রাণী এলে সে কি জবাব দেবে? বন্দী প্রদীপ কুমারকে নিয়ে আওরঙ্গ যে এভাবে উধাও হবে, ভাবতেও পারেনি সে।

চন্দনা যখন দিশেহারার মত ভাবছে তখন রহমত এসে হাজির।

কথাটা রহমতের কানে যেতেই গম্ভীর হয়ে পড়লো। সোজা সে এসে হাজির হলো চন্দানার কাছে।

চন্দনা বিপদগ্রস্তের মত বললো—রহমত, এখন কি উপায় বলো? সব তো শুনেছো?

হাঁ শুনলাম। চন্দনা, তুমি জানো বা জানতে বাইরের কোনো লোককে আস্তানায় নিয়ে আসা অপরাধ। তুমি যে ভুল করেছিলে তার পরিণতি কি হবে কে জানে! আজই রাণীর কাছে সংবাদ জানিয়ে দাও। রহমত কথাগুলো বলে চন্দনার দিকে তাকালো।

চন্দনার মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠেছে। সে নিরুপায়ের মত তাকায় রহমতের দিকে।

রহমত বুঝতে পারে, চন্দনা তার ভুলের জন্য ভীষণভাবে অনুতপ্ত, দুঃখিত, লজ্জিত।

❑

মন্থনার কারাগার থেকে দস্যু বনহুর পালিয়েছে, সংবাদটা ওয়্যারলেসে শোনামাত্র দস্যুরাণী ক্ষিপ্তের মত হয়ে উঠলো। অনুচর রঘুকে লক্ষ্য করে বললো—এক্ষুণি আমি মন্থনায় রওনা দেবো। পাম্পিং সসার প্রস্তুত করো।

রঘুনাথ মাথা নত করে বললো—যাচ্ছি রাণীজি।

বেরিয়ে গেলো রঘুনাথ।

দস্যুরাণী পায়চারী করতে লাগলো। দস্যুরাণীর শরীরে জমকালো পোশাক। পোশাকটা মশালের আলোতে চক্ চক্ করছে। পায়ের বুটে শব্দ হচ্ছে খট্ খট্ খট্।

এমন সময় দস্যুরাণীর একজন অনুচর এসে একখানা চিঠি দিলো—রাণীজী চিঠি।

দস্যুরাণী চিঠিখানা মেলে ধরলো চোখের সম্মুখে। চিঠিতে লিখা আছে—

রাণী, আমি ঝিন্দে যাচ্ছি। যদি
সময় পাও তবে ঝিন্দে এসো, জরুরি
কথা আছে।
—মিঃ চৌধুরী

চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করে রেখে দিলো টেবিলে। তারপর লোকটাকে লক্ষ্য করে বললো—এ চিঠি কে তোমাকে দিলো মসিয়ে?

একটা লোক! লোকটা রায়হান থেকে এসেছে জানালো।

গর্জন করে উঠলো দস্যুরাণী—সে কি করে আমার এই আস্তানার সন্ধান পেলো?

আমরা কেমন করে জানবো রাণীজী!

তাকে আটক করেছো?

হাঁ।

নিয়ে এসো আমার সম্মুখে।

মসিয়ে চলে গেলো!

দস্যুরাণী মুখের আবরণ টেনে দিলো।

একটু পরেই ফিরে এলো মসিয়ে, সঙ্গে তার একটি লোক। লোকটার হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। লোকটা মোটেই ঘাবড়ে যায়নি তার চোখ মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারে দস্যুরাণী।

দস্যুরাণী লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠে, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—দস্যুরাণীকে কুর্ণিশ জানাতে হয়, এ কথাও বলে দিতে হবে?

লোকটা দস্যুরাণীর দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু, কোনো জবাব দিলো না।

দস্যুরাণী বললো—বলুন কি করে আপনি আমার আস্তানার পথ চিনে নিলেন সমীর কুমার বাবু?

এবার লোকটা বলে উঠে—চিনতে পেরেছো তাহলে রাণী?

হাঁ, আপনার ছদ্মবেশে নিখুঁত নয় সমীর কুমার বাবু। শুনুন, আপনার বন্ধুকে বলবেন আমি মন্থনায় যাচ্ছি। দস্যু বনহুর আমার মন্থনা কারাগারে আবদ্ধ ছিলো, সে ঐ কারাগার থেকে পালিয়েছে। ঝিন্দে সময়মত যাবো।

আচ্ছা রাণী, বলবো।

কিন্তু আপনি নিজে না এলেই পারতেন।

না এলে বন্ধু রাগ করতো, তাই......

বুঝেছি, আপনার বন্ধুর চেয়ে আপনার গরজটাই যেন বেশি মনে হচ্ছে। যাক, আজ এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যাবেন।

না রাণী, আজই আমাকে রওনা দিতে হবে। আমার বাহন সীমান্তে অপেক্ষা করছে।

দস্যুরাণী বললো—খাওয়া-দাওয়া করে তবেই রওনা দেবেন কুমার বাবু।

তাতে আমার অমত নেই। এতটা পথ এসেছি ক্ষুধাও পেয়েছে। সমীর খুশি হয়ে কথাগুলো বলে।

দস্যুরাণী মসিয়েকে লক্ষ্য করে বললো—মসিয়ে, ইনি প্রখ্যাত গোয়েন্দা আহাদ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ সমীর কুমার। এঁর যেন কোনো অসম্মান না হয়। এঁকে নিয়ে যাও, আমার খাবার টেবিলে বসিয়ে খাওয়াবে।

নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে বলে মসিয়ে—আচ্ছা রাণীজী।

সমীর কুমারও একটু হেসে দস্যুরাণীকে অভিবাদন জানায়।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় রঘুনাথ—রাণীজী, সসার প্রস্তুত।

আচ্ছা চলো।

দস্যুরাণী এবং রঘুনাথ এসে দাঁড়ায় আস্তানার এক প্রান্তে, যেখানে পাম্পিং সসার অপেক্ষা করছিলো।

দস্যুরাণী সসারে চেপে দাঁড়াতেই সসার উড়ে উঠে আকাশে। রাত্রির অন্ধকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটা নীলাভ আলোকরশ্মি।

রঘুনাথ হাত নাড়তে থাকে।

উড়ন্ত সসার উড়ে চলে আকাশে।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলো, সসারটা মুহূর্তে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ফিরে চলে রঘুনাথ।

❑

সমীর কুমারকে ততক্ষণে রাণীজীর টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।

সমীর খাবার টেবিলে বসে অবাক হয়ে দেখছে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ভূগর্ভে এমন বিশাল কক্ষ সে কোনোদিন দেখেনি। কক্ষ গুলো জমকালো পাথরে তৈরি। মাঝে মাঝে বেলোয়াড়ী ঝাড় ঝুলছে। ঝাড়ে মোমের আলো জ্বলছে। কয়েক হাতে দূরে দূরেই দেয়ালে ঢাল তলোয়ার আটকে রাখা হয়েছে। বর্শা-বল্লম আর তীর ধনুও আছে। আছে রাইফেল-বন্দুক আর হালকা মেশিন গান।

সমীর খেতে বসে আরও অবাক হলো, টেবিলে রুচিসম্মত খাবার থরে থরে সাজানো।

সমীর কুমার আসলে পেটুক মানুষ, খাবার দেখে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। হাপুস হুপুস খেয়ে নেয় সে যত পারে তারও কিছুটা বেশি।

রাণীজীর টেবিল। অবাক হয়ে দেখে সমীর কুমার। এমন টেবিল কোনোদিন দেখেনি। আবলুস রঙের টেবিল, যেন আয়নার মত দাঁত মুখ দেখা যায়। টেবিলের চারপাশে মূল্যবান চেয়ার। যে চেয়ারে রাণী বসে সে চেয়ারখানা সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো।

পা রাখার জন্য একটি পাদানী। সেটাও রৌপ্যের তৈরি, ঠিক যেন একটি ফুটন্ত পদ্মফুল। বড় সুন্দর মনোরম কক্ষ সেটা, সমীর কুমার দেখে শুধু হতবাকই হয় না, একেবারে নির্বাক হয়ে যায় যেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিদায় নিলো সমীর কুমার। দস্যুরাণী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে মন্থনায়। পাম্পিং সসারের গতি ছিলো ঘন্টায় হাজার হাজার মাইল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্থনায় পৌঁছে দস্যু রাণী তার অনুচরদের ডাকলো।

দস্যুরাণী কঠিন কণ্ঠে বললো—তোমরা এতবড় অপদার্থ যার জন্য আমাদর কারাগার থেকে দস্যু বনহুর পালাতে সক্ষম হলো। আমার নির্দেশ যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে না আনতে পারো তাহলে সবাইকে আমি চরম শাস্তি দেবো।

দস্যুরাণী অনুচরদের আদেশ দিয়ে ফিরে এলো তার নিজ দরবার-কক্ষে। সেখানে চন্দনা এবং কয়েকজন অনুচর ছিলো।

চন্দনার মুখে কোনো কথা নেই, সে নতমস্তকে দাঁড়িয়েছিলো কক্ষের একপাশে।

দস্যুরাণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চন্দনাকে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়। দস্যুরাণী জানতে পেরেছিলো, চন্দনা যে বৃদ্ধ সারেঙ্গ আওরঙ্গকে জাহাজ শাহানশাহ থেকে নিয়ে এসেছিলো, সেই বৃদ্ধই কারাগার থেকে দস্যু বনহুরকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে এবং বন্দী করে রেখে গেছে যারা কারাকক্ষটিকে পাহারা দিচ্ছিলো তাদেরকে।

কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো দস্যুরাণী। চন্দনার ভুলের জন্যই যে এমন একটা অঘটন ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে দস্যুরাণী থমকে দাঁড়ালো। তারপর আসনে উপবেশন করে ডাকলো—চন্দনা!

চন্দনা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো, সে দৃষ্টি তুলে তাকাবার সাহস করলে না।

দস্যুরাণী এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—যে ভুল তুমি করেছো চন্দনা, জানো তার শাস্তি কি?

চন্দনা এবার ভীত দৃষ্টি তুলে তাকালো দস্যুরাণীর মুখের দিকে। দস্যুরাণীকে সে তার সঙ্গে এমন কঠিনভাবে কোনোদিন কথা বলতে দেখেনি বা শোনেনি। ঢোক গিলে কিছু বলতে চেষ্টা করলো চন্দনা কিন্তু তার শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

দস্যুরাণী এগিয়ে এলো কয়েক পা চন্দনার দিকে। ওর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

কক্ষমধ্যে কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা চোখ তুলে তাকাবার সাহস পাচ্ছিলো না। দস্যুরাণীর বুট পরা পা দু'খানার দিকে মাঝে মাঝে তাদের দৃষ্টি এসে পুনরায় ফিরে যাচ্ছিলো নিজ নিজ চরণ-যুগলে।

দস্যুরাণীর কথায় অনুচরদের মুখ বিবর্ণ হলো, তারাও মনে মনে শিউরে উঠলো।

দস্যুরাণী বললো—চন্দনা, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে বাইরের একজনকে আস্তানায় নিয়ে এসে যে অপরাধ করেছিলে তার শাস্তি তোমার মৃত্যুদণ্ড।

রাণী!

হাঁ, যদিও তুমি আমাকে কথাটা পরে বলেছিলে তবু তোমার অপরাধ অখণ্ডনীয়। কারণ তখন তুমি ভুল করে বসেছো। দস্যুরাণী কথাটা বলে বেরিয়ে যায় দ্রুত দরবারকক্ষ থেকে।

নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে একটা শূন্য আসনে উপবেশন করে দস্যুরাণী।

কতক্ষণ কেটে যায়।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রহমত।

দস্যুরাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বলে—রাণীজী।

বলো কি বলতে চাও?

চন্দনার জন্য কি মৃত্যুদণ্ডই শ্রেয়?

হাঁ রহমত।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয়—যাও রহমত, তিন দিন ওকে কারাগারে বন্দী রেখে চতুর্থ দিনে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করবে।

রাণীজী!

যাও রহমত, আর কোনো কথা নয়।

রহমত একবার রাণীর মুখ অসহায় করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

❑

সর্দার।

কে রহমান?

হাঁ।

কি সংবাদ?

দস্যুরাণী তার বান্ধবী এবং সহচরী চন্দনা নামক এক তরুণীর মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছে। আর অন্যান্য অনুচরকে কারাকক্ষে বন্দী রেখে তাদের বেত্রাঘাত করা হচ্ছে।

চন্দনা নামক তরুণীই আমাকে দস্যুরাণীর আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিলো, ঐ তরুণীরই নাম ছিলো সিমকী। রহমান, এই তরুণী যাতে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত হতে না পারে, এজন্য আমাকে পুনরায় মনস্থ যেতে হবে। তার পূর্বে আমি একবার মিঃ হেলালীর সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করেছি।

সর্দার, আদেশ করুন কি করতে হবে?

তাজকে প্রস্তুত করো।

বেরিয়ে যায় রহমান।

বনহুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে নূরী। মুখোভাব গম্ভীর করে বলে নূরী—শুনলাম আবার তুমি মন্থনায় যাচ্ছো?

বনহুর কোটটা গায়ে পরতে পরতে বলে—হাঁ নূরী।

হুর, মন্থনায় গেলে এবার তোমার বিপদ ঘটবে। কথাটা কঠিন কণ্ঠে বললো নূরী।

বনহুর ফিরে তাকালো নূরীর মুখে, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হাসি থামিয়ে বললো—বিপদ। হুঁম্ বিপদ! বিপদে পড়বে বলে মন্থনায় যাবো না?

নূরী বলে—দাইমা বলেছে, এবার তোমার যাত্রা শুভ নয়।

মিথ্যে কথা।

হুর, তুমি কিছু বিশ্বাস করোনা। দাইমা বৃদ্ধা সে সব জানে, বুঝতে পারে তা ছাড়া আমাদের মায়ের সমতুল্য......

জানি নূরী কিন্তু এবার আমাকে যেতেই হবে। দস্যুরাণী এক অসহায় রমণীকে অহেতুক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। তাকে বাঁচাতে হবে, বুঝলে?

অবাক কণ্ঠে বললো নূরী—দস্যুরাণী! কে সেই দস্যুরাণী?

নূরী, তাকে তুমি চিনবে না, কারণ আমি নিজেও তাকে জানতাম না। সে এক গর্বিতা নারী, সে মনে করে তার মত বীরাঙ্গনা নারী আর কেউ এ পৃথিবীতে নেই।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে নূরী—রাণী দুর্গেশ্বরী ছিলো এক গর্বিতা নারী, সেও নিজকে অনেক বড় মনে করতো।

এই দস্যুরাণী তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালিনী নারী, যার নাম স্মরণে পৃথিবীর এক অংশের জনগণ ভয়ে কম্পমান হয়।

সত্যি?

হাঁ।

তুমি তাকে দেখেছো?

তার বন্দীশালা থেকে প্রদীপ কুমারকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছি। তাকেও ইচ্ছা করলে বন্দী করতে পারি। কিন্তু......

কিন্তু কি, বলো থামলে কেন?

তাকে বন্দী করতে চাই না। নূরী, দস্যুরাণীর একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে।

কি কাহিনী বলবে?

শুনেছি দস্যুরাণীও নাকি তোমার মত এক দস্যুকন্যা।

নূরী বলে উঠে—দস্যুরাণী দস্যুকন্যা হবে এতে আর অবাক হবার কি আছে?

কিন্তু আসলে সে দস্যুকন্যা নয়।

দস্যুরাণী দস্যুকন্যা নয়?

না। সেই তো এক অদ্ভুত কাহিনী।

সে কাহিনী তুমি জানলে কি করে?

আওরঙ্গের বেশে আমি যখন দস্যুরাণীর মন্থনা আস্তানায় ছিলাম তখন একদিন মদন নামক এক অনুচর আমাকে দস্যুরাণীর জীবন কাহিনী শুনিয়েছিলো। দস্যুরাণীর নাম হলো মিস হেনরী। দস্যু মরেন তাকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছিলো।

দস্যু মরেন?

হাঁ, সে ছিলো জাতিতে খ্রিস্টান। সে নাকি জলদস্যুদলের দলপতি ছিলো। একদিন একটি যাত্রীবাহী জাহাজে হানা দিয়ে তার অনুচরগণ যখন যাত্রীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে চলেছিলো তখন কোনো এক ক্যাবিনে ছিলো হেনরীর বাবা এবং মা। মার সমস্ত দেহে ছিলো মনিমুক্তাখচিত অলঙ্কার। মরেনের অনুচরগণ হেনরীর মাকে আক্রমণ করলে তার বাবা স্থির থাকতে পারে না। সে স্ত্রীকে উদ্ধার আশায় এগিয়ে যায় কিন্তু পারে না স্ত্রীকে রক্ষা করতে, নিহত হয় সে মরেনের অনুচরদের হাতে। হেনরীর মাকেও তারা হত্যা করে, ছিনিয়ে নেয় তারা তার দেহ থেকে মনিমুক্তাখচিত অলঙ্কার।

তারপর?

তারপর মরেন এবং তার অনুচরগণ লুণ্ঠনকার্য শেষ করে যখন নিজেদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছিলো তখন একটি শিশুর করুণ কান্না তাকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। মরেন দেখতে পায় হেনরী তার মৃত মায়ের বুকে পড়ে কাঁদছে।

তারপর?

মরেন ঐ শিশু কন্যাটিকে তুলে নেয় কোলে। নিয়ে আসে নিজের গুহায়।

মরেনই তাহলে তাকে লালন পালন করেছিলো?

হাঁ। সেই সে দিনের অসহায়া ছোট্ট শিশু হেনরী আজকের দস্যুরাণী।

তাহলে দস্যুরাণী কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা?

হাঁ নূরী। একটু থামলো বনহুর, তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলো—নূরী, এ পৃথিবীতে কত মানুষ আছে যারা অবস্থা এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ পালটে যায় বা গেছে। যেমন পালটে গেছি আমি নিজে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বনহুরের বুক চিরে। থেমে বলে—আজ আমি লজ্জা বোধ করি আমার বংশ পরিচয় দিতে। কত অধঃপতনে গেছি আমি......

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়—ছিঃ তুমি এ কথা বলতে পারলে হুর? কে বলে তুমি অধঃপতনে গেছো? তুমি তো কোনো অন্যায় করোনা। যারা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে তুমি তাদের সেই অর্থ এবং ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে যারা অসহায়, যারা সম্বলহীন তাদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। কে বলে তুমি অধঃপতনে গেছো?

আমার মন। আমার মন বলে নূরী। আমি মানুষ নই জানোয়ার। কারণ অনেক সময় আমাকে এমন অনেক কাজ করতে হয় যা আমার কাছে অতি ঘৃণার, অতি জঘন্য। বিবেকের কাছে আমি তখন পরাজিত হই......

মিছামিছি তুমি নিজের উপর অবিচার করছো হুর।

না, মিছামিছি নয়। নূরী, কত সময় আমাকে এমন কাজ করতে হয় যা নিজকে দংশন করে কিন্তু না করে উপায় থাকে না। নূরী, মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, সংযমচ্যুত হই...যা আমার জন্য অন্যায়, হয়তো এমন কাজও করে বসি।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায়—সর্দার।

তাজ প্রস্তুত হয়েছে?

হাঁ।

চলি এবার!

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে যায়।

নূরী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বনহুরকে সে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। ওকে যত দেখে ততই যেন অবাক হয়। বড় অদ্ভুত, বড় বিস্ময় যেন

ও। নূরী শুনতে পায় অশ্বপদশব্দ। বুঝতে পারে বনহুর তাজকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো রহমান।

নূরী তখন জাভেদের জামা সেলাই করতে বসে গেছে। জাভেদ আজকাল শহরের স্কুলে পড়াশোনা করে। তাকে সে কারণে বনহুরের শহরে আস্তানায় থাকতে হয়। জাভেদের দেখাশোনার জন্য রহমানকে তাই বেশি সময় কান্দাই জঙ্গলের আস্তানা ছেড়ে শহরেই থাকতে হয়। কোনো কোনো সময় বিশেষ কারণে রহমান এখানে আসে।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো নূরী—তোমাদের সর্দার আজকাল সব সময় বড় উদাসীন থাকে। আমার মোটেই ভাল লাগে না তার এই উদাসীন ভাব। শুনলাম সে আবার সেই দস্যুরাণীর নিকটে যাচ্ছে।

হাঁ, কিন্তু দস্যুরাণীর নিকটে নয়, একটি অসহায়া রমণীকে দস্যুরাণীর মৃত্যুদণ্ড থেকে উদ্ধার করতে।

শুনেছি কিন্তু সে কাজ তো তার অনুচরদের দ্বারাও সম্ভব হতো?

হতো কিন্তু সর্দারের কর্তব্য তাকে উদ্ধার করা।

কারণ তার জন্যই দস্যুরাণী তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, এই তো?

হাঁ।

রহমান, সত্যিই কি তোমাদের সর্দার দস্যুরাণীর কবল থেকে সেই রমণীকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে, না দস্যুরাণীর সাক্ষাৎলাভ তার কামনা?

নূরী, তুমি এ ধরনের কথা বলবে তা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। সর্দারকে তুমি তাহলে আজও চিনতে পারোনি।

রহমান, সর্দারকে আমি যেমন চিনেছি তেমন করে কেউ কোনোদিন তাকে চিনবে না।

তবে এমন কথা কেন বললে?

জানি না কেন যেন ও আজকাল আস্তানায় থাকতে চায় না। সব সময় আস্তানার বাইরে থাকতে ভালবাসে...

বুঝেছি, সর্দারের উপর তোমার রাগ হয়েছে।

রাগ করে লাভ কি রহমান ভাই। জানি সে কোনোদিন স্থির হবে না শান্ত হবে না...

তুমি কি চাও সর্দার স্থির-শান্ত হোক?

কোন মেয়ে না চায় তার স্বামীকে সব সময় পাশে পেতে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করে নাসরিন।

রহমান একটু হেসে বলে—স্বামীদের মনেরও তেমনি বাসনা সব সময় উঁকি দেয়, কিন্তু...

বলো, থামলে কেন?

কিন্তু উপায় হয় না। যাক, তোমার চঞ্চলা কোথায়?

বাগানে হরিণ নিয়ে খেলা করছে।

নূরী হেসে বললো—একটি মেয়ে তার দশটি নাম। আবার চঞ্চলা হলো কবে থেকে?

রহমান বললো—দেখছোনা কেমন চঞ্চল মেয়েটা, একদণ্ড চুপ চাপ থাকতে দেখি না। কখনও বাগানে হরিণ না হয় বাঘের বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে। কখনও তীরধনু নিয়ে, কখনও তলোয়ার নিয়ে। ঘোড়ায় চড়তেও শিখবে ক'দিন পরে...

কেন, তোমার ভয় হচ্ছে নাকি? বললো নূরী।

নাসরিন হেসে বললো—বাপ মেয়েকে ভয় পাবে না তো ভয় পাবে কাকে। নূরী, সর্দার নাকি আবার মন্থনায় যাচ্ছেন?

হাঁ। বললো নূরী।

নাসরিন বললো—দাইমা যে বললো এবার তার যাত্রা শুভ হবে না?

বলেছিলাম কিন্তু সে শুনবে না।

রহমান বললো—আজ এ কথা নতুন নয়, সর্দার কোনোদিন তার কোনো কাজে কারো মানা শুনেছে মনে পড়ে তোমাদের?

জানি শোনে না, শোনেনি কোনোদিন। কিন্তু এবার আমার মনও বলছে তার না যাওয়াই ভাল ছিলো। বললো নূরী।

নাসরিন বললো—ওগো, তুমিই না হয় সর্দারকে যেতে বারণ করো। দাইমার কথা কোনো সময় বিফলে যাবে না।

এখানে যখন বনহুরকে নিয়ে আলোচনা চলছিলো তখন বনহুর তাজের পিঠে ছুটে চলেছে কান্দাই শহরাভিমুখে।

এক সময় বনহুর পৌঁছে যায় শহরের অনতিদূরে, যেখানে জঙ্গল শেষ হয়ে এসেছে। অদূরে পথের উপর অপেক্ষা করছে বনহুরের গাঢ় নীলাভ রঙের গাড়িখানা। গাড়ির ড্রাইভ আসনে উপবিষ্ট রয়েছে বনহুরের একজন অনুচর।

বনহুর তাজ থেকে নেমে দাঁড়াতেই গাড়ির দরজা খুলে ধরলো ড্রাইভারবেশী বনহুরের অনুচরটি। বনহুর তাজের পিঠে মৃদু আঘাত করে বললো—যা, আস্তানায় ফিরে যা তাজ। পথে দেরী করবি না, চলে যা।

তাজ সম্মুখের একখানা পা দিয়ে মাটিতে মৃদু আঘাত করে শব্দ করলো।

বনহুর ততক্ষণে গাড়িতে চেপে বসেছে।

এবার গাড়িখানা উল্‌কা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর পিছন আসনে বসেছিলো, এবার সে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। সিগারেটের ধূম্ররাশি চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়লো গাড়িখানার মধ্যে।

মিঃ হেলালী তাঁর অফিসকক্ষে বসে সেদিনের একটা সংবাদপত্র মনোযোগ সহকারে পড়ছিলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে ভারী জুতোর শব্দে চোখ তুলে তাকান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেন মিঃ হেলালী কিন্তু চোখ দুটো তাঁর আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললেন তিনি—আপনি... আপনি এসেছেন?

আপনি নয়, বলুন তুমি।

আপনি দস্যু হলেও আমার জীবনরক্ষক, আমার শ্রদ্ধেয় জন। মিঃ হেলালী কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

বনহুর হাস্যোজ্জ্বল মুখে দীপ্ত কণ্ঠে বললো—বসতে আসিনি মিঃ হেলালী, জানতে এসেছি দেশের সংবাদ।

সংবাদ বড় অশুভ। কথাটা বলে মিঃ হেলালী তাঁর হস্তস্থিত পত্রিকাখানা মেলে ধরলেন টেবিলের উপরে। একস্থানে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—মিস দিপালী গতকাল রাত্রিতে তার বাসভবন থেকে নিখোঁজ হয়েছে। কোনো এক চক্রান্তকারী দল তাকে উধাও করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে পড়লো, ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—দিপালী তার বাসভবন থেকে নিখোঁজ হয়েছে। পত্রিকাখানা তুলে নিলো বনহুর হাতে, তারপর মেলে ধরলো চোখের সম্মুখে। ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখখানা। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—ঠিকই বলেছেন মিঃ হেলালী, কোনো চক্রান্তকারী দল তাকে তার বাসভবন থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

মিঃ হেলালী বললেন—তার কক্ষ থেকে একটি চিঠি পাওয়া গেছে।

বনহুর বললো—চিঠি!

হাঁ, চিঠিখানা আমার নিকটেই আছে, কারণ দিপালীর নিখোঁজ সংবাদ শুনে আমি মিঃ জাফরী সহ তার বাসভবনে গিয়েছিলাম। যে কক্ষ থেকে তাকে উধাও করা হয়েছে সেই কক্ষ তল্লাশি চালিয়ে এই চিঠিখানা পাওয়া গেছে। মিঃ হেলালী পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে বনহুরের হাতে দেন।

গাঢ় নীল কাগজে মাত্র কয়েক লাইন লেখাঃ

—বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম
মৃত্যু। আমাদের সঙ্গে মিস
দিপালী যে বিশ্বাসঘাতকতা
করেছে, তার জন্য তাকে আমরা
মৃত্যুদণ্ড দেবো। এ কারণেই
তাকে নিয়ে গেলাম।
—মাকড়সা

কাগজখানায় ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বনহুরের নজরে পড়লো সমস্ত চিঠিখানা জুড়ে একটি মাকড়সার প্রতিচ্ছবি আঁকা রয়েছে।

বনহুর কিছুক্ষণ কাগজখানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে রইলো, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে।

মিঃ হেলালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো দস্যু বনহুরের মুখে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো—মিঃ হেলালী, কে সে মাকড়সা জাল যে মিস দিপালীকে উধাও করেছে? সে যেই হোক তার মাকড়সার জাল ছিঁড়ে খান খান করতে হবে। দাঁতে দাঁত পিষে কথা শেষ করলো বনহুর।

মিঃ হেলালী বললেন—দ্বিপালীর সহযোগিতায় আমরা দেশের জন-গণের উপকারে কিছুটা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে একটি জঘন্য চোরাকারবারী দলকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি।

হাঁ, সেই কারণেই মাকড়সা দিপালীকে তার জালে টেনে নিয়েছে। মিঃ হেলালী, একটা বিরাট বিদেশী চক্রান্তজালে দেশটা আজ জড়িয়ে পড়েছে, যার জন্য আজ দেশের জনগণের এই অবস্থা। এই বিদেশী চক্রান্তের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে, নাহলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না। থামলো বনহুর।

মিঃ হেলালী বললেন—আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যাতে এই বিদেশী চক্রান্তকারী দলকে আমরা শায়েস্তা করতে পারি।

বনহুর বললো—সেজন্য আপনাদের আমি জানাই সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু চক্রান্তকারী মাকড়সা কারা, তাদের যতক্ষণ না খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছেন ততক্ষণ আপনারা কি করে তাদের শায়েস্তা করবেন? আমি আজ বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারছি না। মিঃ হেলালী, আপনি মিস দিপালীর সন্ধান করুন এবং তার উদ্ধারের চেষ্টা চালান। চিঠিখানা আপাততঃ আমার কাছে রইলো, সময়মত পাবেন।

মিঃ হেলালী কিছু বলবার পূর্বেই বেরিয়ে যায় বনহুর। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন মিঃ হেলালী। বাইরে শোনা যায় মোটর ছাড়ার শব্দ।

বনহুর ফিরে আসে তার শহরের আস্তানায়। জাভেদ ছুটে আসে পিতার পাশে, দু'হাতে পিতার হাত চেপে ধরে বলে—আব্বু তুমি এসেছো?

বনহুর ওকে টেনে নেয় কাছে, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—এইতো এসেছি। কেমন আছো জাভেদ?

খুব ভাল আছি আব্বু। জানো আমি ঘোড়ায় চড়তে শিখেছি। তীরধনু চালাতে শিখেছি...

আর পড়াশোনা? বলে বনহুর।

পড়াশোনা আমার মোটেই ভাল লাগে না আব্বু। পড়ে কি হবে বলো তো?

বনহুর পুত্রের প্রশ্নে চমকে উঠলো যেন, বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো সে জাভেদের মুখের দিকে, বললো—পড়াশোনা না করলে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয় না, বুঝলে? তাই পড়াশোনা করতে হয়।

আমি পারবো না পড়তে। মুখ বাঁকা করে রইলো জাভেদ।

বনহুর ডাকলো—কায়েস?

ছুটে এসে কুর্ণিশ জানালো কায়েস—সর্দার।

জাভেদ পড়াশুনা কেমন করছে?

কায়েস চোখ তুলে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো জাভেদকে, তারপর বললো—ভালই পড়াশোনা করছে।

মিথ্যে কথা!

সর্দার!

চলো কোথায় জাভেদের বইখাতা আমাকে দেখাও, চলো। জাভেদ, তুমিও চলো, আমি আজ পরীক্ষা করে দেখতে চাই লেখাপড়ায় তুমি কতদূর অগ্রসর হয়েছো।

জাভেদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কায়েসও নিশ্চল।

বনহুর রাগতঃ কণ্ঠে বলে—চলো।

এবার কায়েস এবং জাভেদ সম্মুখে পা বাড়ালো।

জাভেদের কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো বনহুর, টেবিলে কতকগুলো ছেঁড়া বইয়ের স্তূপ। টেবিলে পিস্তল, তীরধনু আর তলোয়ার পড়ে আছে। বনহুর খুব ভালভাবে এসব লক্ষ্য করলো, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—জাভেদ, তোমার টেবিলে এসব অস্ত্র কেন?

জাভেদ নির্ভীক কণ্ঠে বললো—আমি এসব অস্ত্র চালানো শিখছি।

এসব অস্ত্র চালানো শিখে তুমি কি করবে? কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর।

জাভেদ তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো—দস্যুতা করবো।

গর্জন করে উঠলো বনহুর—জাভেদ!

আব্বু, আমি জানি তুমি কে, কি করো সব আমি শুনেছি। তুমি যেমন বিশ্ববিখ্যাত দস্যু, আমিও......

জাভেদ.....,একটা শব্দ করে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেয় বনহুর তার পুত্রের গালে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে যায় সে কক্ষ থেকে—

সোজা বনহুর ফিরে আসে তার আস্তানায়।

রহমান তার দলবল নিয়ে অস্ত্র পরিষ্কার কবছিলো, এমন সময় বনহুর এসে দাঁড়ায় সেখানে।

বনহুরকে দেখে তার অনুচরগণ বিস্মিত না হলেও চমকে উঠে ভীষণভাবে। সবাই নিজ নিজ অস্ত্র ভূতলে রেখে সর্দারকে অভিবাদন জানায়। হঠাৎ সর্দার সশরীরে এখানে এসে হাজির হবে, তারা ভাবতেও পারেনি।

বনহুরের মুখোভাব দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়েছিলো। রহমান নিজেও একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো, কারণ সর্দারের মুখোভাব স্বাভাবিক ছিলো না। তাছাড়া সর্দার কখন ফিরে এসেছে তাও তারা টের পায়নি।

বললো বনহুর—রহমান, জাভেদকে শহরের আস্তানায় কেন রাখা হয়েছে?

রহমান এবং অন্যান্য অনুচর মুহূর্তমধ্যে যেন চমকে চোখ তুললো, সর্দারের মুখে তাকালো সবাই। রহমান বললো—সর্দার, জাভেদকে শহরের আস্তানায় পড়াশোনা শেখার জন্য রাখা হয়েছে।

কিন্তু সেকি পড়াশোনা করছে সেখানে?

রহমান নীরব।

বনহুর বলে উঠে—পড়াশোনার বদলে সে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করছে না?

রহমান বললো—প্রথমে সে ভালভাবেই পড়াশোনা করছিলো, কিন্তু......

বলো, থামলে কেন?

ইদানীং সে পড়াশোনায় মোটেই আগ্রহী নয়।

বনহুর রহমানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো—শুধু অস্ত্র চালনায় উৎসাহী, কেমন?

হাঁ সর্দার।

কে তাকে অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে?

রহমান নীরব।

বনহুর বললো—আমি চাই না আমার সন্তানগণ আমার পথ অনুসরণ করে। একটু থেমে বললো সে—জাভেদকে তুমিই তাহলে অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছো?

রহমান এতক্ষণ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো, এবার সে দৃঢ়কণ্ঠে বললো—যার মধ্যে যে স্পৃহা আছে তা কোনোদিন কেউ দমন করে রাখতে পারে না। সর্দার, জাভেদের মধ্যে আছে আপনার রক্ত কাজেই এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে দাবিয়ে রাখে বা রাখতে পারে।

কথাগুলো বলে থামলো রহমান।

বনহুর রহমানের কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না। গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে।

রহমান বললো আবার—সর্দার, জাভেদ যা করতে চায় তাতে তাকে ব্যধা দেওয়া সমীচীন হবে না। তার মধ্যে আমি দেখেছি এক অদ্ভুত দীপ্ত ভাব। অসীম এক শক্তির উৎস লুকিয়ে আছে তার মধ্যে।

বনহুর কোনো কথা না বলে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় সেই গুহা থেকে।

ফিরে আসে বনহুর নিজের বিশ্রামকক্ষে। শরীর থেকে পোশাক না খুলেই অর্ধশায়িত অবস্থায় হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় সেখানে, বনহুরকে গম্ভীরভাবে সিগারেট পান করতে দেখে একটু হেসে বলে সে—হঠাৎ কি হলো বলো তো অমন চুপচাপ রয়েছো কেন?

বনহুর চোখ তুলে তাকালো নূরীর মুখে, তারপর বললো—আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো।

কি ভেবেছিলে হুর?

ভেবেছিলাম জাভেদ অমানুষ হবে, তাই হয়েছে সে।

হুর!

হাঁ নূরী।

তুমি এসব কি বলছো?

ঠিকই বলছি। আজ জাভেদের সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে আমি বড় দুঃখ পেয়েছি, কারণ জাভেদ লেখাপড়া না শিখে অস্ত্র চালনা শিখছে।

নূরী হেসে উঠলো খিলখিল করে।

বনহুর সোজা হয়ে বসে অবাক হয়ে তাকালো, বললো—হাসছো যে বড়?

মেষশাবক মেষই হয় আর সিংহশাবক সিংহই হয়। জাভেদ বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুরের সন্তান, সে কোনোদিন......

নূরী!

হাঁ, আমি জানি জাভেদ তোমার চেয়ে বড় না হতে পারলেও তোমার চেয়ে কম হবে না।

নূরী, তুমি কি চাও সে অমানুষ হোক?

হুর, তুমি কি নিজে অমানুষ?

হাঁ আমি অমানুষ। কারণ মানুষ যা না করে আমি তাই করি। যদিও আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সবাই জানে আমি মহৎ আমি মহান কিন্তু আমি নিজে জানি আমি যা করি তা অন্যায়।

হুর, তুমি এসব কি বলছো?

সত্যি নূরী, আইনের চোখে আমি অপরাধী, আমি দোষী। কারণ কোন ধর্মেই নাই একজনের সম্পদ ছিনিয়ে আর একজনকে দেওয়া।

তুমি তো কোনো সৎ মহৎ ব্যক্তির সম্পদ লুটে নাও না, তুমি যা কর লোকের মঙ্গলের জন্য করো।

তবু আমি অপরাধী। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করি কিন্তু......

হুর!

হাঁ নূরী, মন বিষিয়ে উঠে যখন এই পৃথিবীর আসল রূপ আমার চোখে ধরা পড়ে। কি করে মানুষ...মানুষ হয়ে একজনের মুখের গ্রাস আর একজন কেড়ে খায়। কুকুরের চেয়েও আজ দেশের মানুষ হীন, জঘন্য। নিজের স্বার্থের জন্য উন্মাদ। কি করে জনগণের আহার গুদামজাত করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করবে, কি করে গাড়িবাড়ি ঐশ্বর্য বাড়াবে, আজকের দুনিয়ায় যেন তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এক শ্রেণীর ধনকুবের ধনের কুমির বনে আরও পাওয়ার আশায় কুৎসিত ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ আজ উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ, ক্ষুধা-পিপাসায় পথে পথে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। নূরী এসব দেখেও কি স্থির থাকতে পারা যায়? পারি না, তাই এত জেনেও মানুষ হয়ে অমানুষের কাজ করি! আইন ছিন্ন করে অন্যায়কে আঁকড়ে

ধরি...কিন্তু পরপরই বিবেকের কাছে দংশিত হই। তখন মনে হয় নিজকে হত্যা করে মুক্তি লাভ করি।

হুর, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো ? নূরী বনহুরের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

বনহুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলে—ভেবেছিলাম জাভেদ লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। যেমন নূর আজ লেখাপড়া শিখে তার মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে তুলেছে। জানো, নূর তাদের স্কুলের মধ্যে শিক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে।

এ যে আমারও পরম আনন্দ। আমি জানতাম, নূর একদিন এমনিই হবে। সেও যে তোমারই সন্তান। তার ধমনিতেও যে প্রবাহিত হচ্ছে তোমারই রক্ত। নূর বড় হবে শিক্ষা-দীক্ষা আদর্শে আর জাভেদ হবে তোমারই মত সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু সর্দার......

নূরী!

হাঁ, কোনো শক্তিই তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে করবে সে সংগ্রাম, যেমন করে চলেছো তুমি।

নূরী, তুমি কি তাহলে খুশি হও?

হাঁ, আমি খুশি হই।

বেশ, তাহলে জাভেদ তোমার মনের মত হয়েই গড়ে উঠুক।

তুমি দোয়া করো তাই যেন হয়। কথাটা বলে নূরী স্বামীর বুকে মাথা রাখে। একটু পরে বলে সে—তুমি মন্থনায় যাচ্ছো?

হাঁ, যেতে হবে।

না গেলেই কি নয়?

নূরী, একটা অসহায় তরুণী বিনাদোষে প্রাণ হারাবে, এ আমি চাই না। সিমকী নামক এক তরুণী...

আমি রহমানের মুখে সব শুনেছি।

তাহলে বলো তার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমি নই কি? কাজেই আমাকে যেতেই হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দস্যুরাণী হেনরীর সাঙ্গে আমাকে মোকাবেলা করতে হবে।

বেশ যাবে যাও কিন্তু তুমি কতদিন মনিরা আপার সঙ্গে দেখা করোনি স্মরণ আছে?

আছে, মাত্র কয়েক মাস।

কিন্তু সেখানে আছেন তোমার মা, তাঁর সঙ্গেও তুমি কতদিন সাক্ষাৎ করোনি।

হাঁ, অনেকদিন মাকে দেখেনি নূরী। সত্যি, মা হয়তো আমার জন্য বড় চিন্তিত আছেন।

তবে তুমি বিলম্ব করোনা, মায়ের সঙ্গে দেখা করে তারপর পুনরায় মন্থনায় যাবে।

নূরী, ঠিক বলেছো, মাকে না দেখে, মার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যাবো না কোথাও।

তবে আজই রাতে তুমি কান্দাই যাও।

হাঁ, তাই যাবো কিন্তু...

জানি সেখানে তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্য অহরহ পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

তবু আমাকে যেতে হবে।

সাবধানে যেও কিন্তু।

নূরী, সত্যি তুমি সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়। পৃথিবীতে এমন অনেক কম মেয়েই আছে যে তার স্বামীকে হাসিমুখে...

বিপদের মুখে সঁপে দিতে পারে, এই তো?

মেয়েরা স্বামীকে মৃত্যু গহ্বরেও ঠেলে দিতে পারে তবু পারে না দ্বিতীয় নারীর হাতে স্বামীকে সমর্পণ করতে। নূরী, তুমি সেদিক দিয়ে অদ্বিতীয়া।

দোয়া করো যেন যেন তোমার সুখের জন্য, তোমার আনন্দের জন্য হাসিমুখে প্রাণও বিলিয়ে দিতে পারি।

নূরী...বনহুর ওকে টেনে নেয় গভীর আবেগে।

❑

মনিরা আয়নার সম্মুখে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো। টেবিলে নানা রকম প্রসাধনী দ্রব্য থরে থরে সাজানো রয়েছে। মনিরা এসব ভুলেও কোনোদিন ব্যবহার করে না। হঠাৎ কোনোদিন যদি কোথাও বেড়াতে যায় তখন একটু আধটু গ্রহণ করে মনিরা, যতটুকু না হলে নয়।

আজ মনিরা কোনো এক বান্ধবীর বাড়ি বেড়াতে যাবে, তাই সে নিজকে সুন্দর করে সাজালো। কোন্ রঙের টিপ পরবে ভাবছে মনিরা, যদিও তার শাড়ি এবং ব্লাউজখানা ছিলো ফিকে গোলাপী রঙের।

মনিরা গোলাপী রঙের টিপদানটা হাতে তুলে নিতেই কে যেন বললো...উঁহুঁ ওটা নয়, গাঢ় নীল। চমকে পিছু তাকালো—না, কেউ তো নেই ঘরে। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে গাঢ় নীল রঙের টিপ দানীটা সে তুলে নিলো হাতে।

টিপ পরে তাকালো সে আয়নায়, অপূর্ব লাগছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ যেন বেশি সুন্দর লাগছে তাকে। কয়েক গোছা চুল ছড়িয়ে পড়ে আছে ললাটের চারপাশে। এ চুলগুলো যেন বড় অবাধ্য, চিরুনী দিয়ে বার বার সংযত করার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই সেগুলো সংযত হয়নি। কোঁকড়ানো এই চুলগুলো ছড়িয়ে থাকে সব সময় ললাটের উপরে। মনিরা শেষবারের মত চিরুণী দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় ড্রাইভার কক্ষে প্রবেশ করে সালাম জানালো।

অবাক হলো সে। ড্রাইভারকে তার ঘরে প্রবেশ করার সাহস দেখে একটু রাগতঃ কণ্ঠেই বললো মনিরা— তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি আসছি।

ড্রাইভার বেরিয়ে গেলো।

মনিরা আয়নায় আর একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিয়ে ব্যাগ তুলে নিলো হাতে, তারপর শাশুড়ির ঘরে প্রবেশ করে বললো— মামীমা!

যাও মা তাড়াতাড়ি যাও, শিগ্‌গির ফিরে এসো।

মনিরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

মনিরা গাড়ির নিকটে পৌঁছতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

মনিরা গাড়িতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললো। কোথায় যেতে হবে পূর্বেই ড্রাইভারকে বলা ছিলো, কাজেই মনিরা গাড়িতে বসে কোনো কথা বললো না।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

মনিরা নিশ্চুপ বসে আছে, দৃষ্টি তার বাইরের দিকে। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাজপথে আলোগুলো এখনও জ্বলে উঠেনি। নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে লাইটপোষ্টগুলো।

পথের দু'ধারে দোকান এবং গাড়িগুলোকে এক একটা দৈতের মত মনে হচ্ছে। বেলাশেষের নিস্প্রভ সূর্য ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে যাচ্ছে ঐসব দৈত্য সমতুল্য বাড়িগুলোর পিছনে।

মনিরা আনমনে কি যেন ভাবছিলো সে-ই জানে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এলো তার, কখন যে তার গাড়িখানা নির্জন পথে এসে পড়েছে খেয়াল করেনি মনিরা। চমকে সোজা হয়ে বসে বললো—ড্রাইভার, এ তুমি কোন্ পথে নিয়ে এলে?

পুরোন ড্রাইভার, কাজেই সে সব পথ চেনে তাই মনিরা তাকে কোনো পথের নির্দেশ দেয়নি। তাকিয়ে দেখলো এটা সম্পূর্ণ অজানা পথ। পথের দু'পাশে আলোকগুলো ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে। মনিরা কথায় বললো ড্রাইভার—নতুন পথে।

মনিরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—এসব তুমি কি বলছো?

হাঁ আপামনি, এ নতুন পথ।

ততক্ষণে একটি পোড়াবাড়ির সম্মুখে এসে গাড়িখানা থেমে গেছে।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলো—নেমে আসুন।

না, আমি নামবো না। আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে এলে?

সত্যি নামবে না?

একি তুমি!

হাঁ, তাছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।

মনিরার মুখমণ্ডলে একরাশ খুশীর উচ্ছলতা ছড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটো আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠে ওর। নেমে দাঁড়ায় গাড়ি থেকে।

ড্রাইভার এগিয়ে যায় পোড়োবাড়িখানার দিকে।

মনিরা ওকে অনুসরণ করে।

একটি অর্ধভগ্ন দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ফেলে। মনিরাকে লক্ষ্য করে বলে—এসো!

মনিরা নির্বাক পুতুলের মত পা পাড়ায়।

ড্রাইভার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতেই একটি প্রশস্ত উঠান—উঠান পেরিয়ে মস্তবড় টানা বারান্দা। বারান্দার পরই বেশ বড় বড় কয়েকখানা ঘর।

মনিরা তাকিয়ে দেখে উঠানে আগাছা আর জঙ্গলে ভরা। কতদিন যে এ বাড়িতে লোক নেই কে জানে। জঙ্গলে আর আগাছায় উঠানে পা রাখার জায়গা নেই যেন।

ড্রাইভার তারই মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে এগুলো। মনিরা ওকে অনুসরণ করে চলেছে।

বারান্দায় পা রাখতেই কতকগুলো বাদুড় পাখা ঝাপটে উড়ে উঠলো।

মনিরা চমকে ড্রাইভারকে আঁকড়ে ধরলো।

ড্রাইভার ওকে নিবিড় করে টেনে নিলো কাছে।

মনিরা বুঝতে পারে বহুদিন এ বাড়িতে মানুষের পদক্ষেপ না পড়ায় বাদুড়ের দল আস্তানা গেড়ে বসেছে। ড্রাইভারের কাছ থেকে নিজকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো মনিরা।

কিন্তু ড্রাইভার মনিরাকে মুক্তি দিলো না।

বললো মনিরা—এমন করে এখানে নিয়ে আসার কি দরকার ছিলো বলো তো?

জানো তো চৌধুরী বাড়ির চারপাশে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি সদা বিচরণ করে ফিরছে। কতদিন তোমাকে একান্ত নিবিড় করে পাইনি, তাই...

তাই তুমি নিয়ে এলে এই পোড়াবাড়ির অভ্যন্তরে একান্ত নিবিড় করে পাবার জন্য?

হাঁ মনিরা।

বনহুর এগিয়ে গিয়ে একটি কক্ষের দরজায় মৃদু চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় দরজাখানা। মনিরা বিস্ময় নিয়ে দেখে একটি সুড়ঙ্গপথ সেই কক্ষের মেঝেতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুর মনিরার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলে—এসো।

মনিরা বললো—ভয় করছে।

বনহুর হেসে বললো—দস্যুসঙ্গিনীর ভয়! এসো বলছি।

চলো, কিন্তু...

কোনো কিন্তু নয়, আজ সমস্ত রাত তোমাকে এখানে কাটাতে হবে।

মনিরার হাত ধরে বনহুর সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে চলে। সুড়ঙ্গপথ আধো অন্ধকার হলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো সব। মনিরা যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই

বিস্মিত হতবাক হচ্ছে। একটা নীলাভ আলোচ্ছটা সুড়ঙ্গপথটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

স্বামীর হাতের মুঠায় মনিরার হাতখানা এখনও ধরা আছে। হৃদয়ে ওর অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস, এমনি করে স্বামীর হাতে হাত রেখে সে যদি যুগ যুগ চলতে পারতো তাহলে সে জীবনে সব চাইতে বেশি খুশি হতো।

সুড়ঙ্গপথ আঁকাবাঁকা হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে।

বনহুর বললো—মনিরা, এটা আমার একান্ত নির্জন গোপন গুহা। সম্মুখ অংশ পোড়োবাড়ি হলেও এর নিচে আছে একটি বিরাট গহ্বর। এখানে শুধু আমি ছাড়া আর কেউ নেই বা থাকে না। মনিরা, এখানে শুধু তুমি আর আমি......

তোমার মুখের আবরণ আমার কেমন যেন ভয় করছে।

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

না।

চলো গন্তব্য স্থানে পৌঁছে তুমি দেখবে তোমার স্বামীকে। এসো...

মনিরা আর বনহুর সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে চলে।

প্রায় দশ মিনিট চলার পর একটি বিরাট গুহার মধ্যে এসে দাঁড়ালো ওরা দু'জনা। প্রশস্ত প্রকাণ্ড সে গুহা। কেমন যেন থম থম করছে গুহাটা। চারদিকের দেয়ালে বড় বড় জীবজন্তুর মূর্তি মূর্তিগুলো যেন গ্রাস করতে আসছে।

মনিরা স্বামীর হাতখানা শক্ত করে এঁটে ধরলো।

বনহুর বললো—ভয় নেই মনিরা, যতক্ষণ আমি তোমার পাশে আছি।

এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?

তোমার স্বামীর নিভৃত কক্ষে।

এই বুঝি তোমার নিভৃত কক্ষ?

বনহুর এগিয়ে গিয়ে গুহার দেয়ালে একস্থানে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের কিছু অংশ সরে গেলো। মনিরা অবাক হয়ে দেখলো একটি সুন্দর দরজা।

বনহুর মনিরার হাত ধরে বললো—এসো।

বড় মনোরম সুন্দর সজ্জিত একটি কক্ষ।

মনিরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলো। সুন্দর মূল্যবান আসবাবে কক্ষটি সাজানো রয়েছে। সুন্দর খাটের উপরে দুগ্ধফেনিল বিছানা পাতা। একপাশে একটি মার্বেল পাথরের তৈরি টেবিল। টেবিলে একটি সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

মনিরা অবাক হয়ে দেখছে।

বনহুর এগিয়ে গেলো ওপাশের কতকগুলো লৌহসিন্দুক থরে থরে সাজানো রয়েছে। বনহুর একটির পর একটির ডালা তুলে ধরলো।

মনিরার চোখ দুটো যেন ছানাবড়া হয়ে উঠলো। লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় সিন্দুকগুলো পরিপূর্ণ! একটি দুটি তিনটি চতুর্থ এবং পঞ্চম সিন্দুকের ডালা খুলতেই কক্ষটা ঝলমল করে উঠলো। হীরা-পান্না-মনিমুক্তাখচিত স্বর্ণ অলঙ্কারে ঠাসা রয়েছে সিন্দুকগুলো।

মনিরা অবাক কণ্ঠে বললো—এসব তোমার?

না।

তাবে কার?

যদি বলি তোমার!

না, আমি ওসব গ্রহণ করতে পারবো না। ওসব আমি চাই না।

মনিরা!

হাঁ, আমার লোভ নেই, আমি শুধু চাই তোমাকে।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—সত্যি তুমি অপূর্ব মনিরা। আমি জানতাম, নারীজাতি ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল কিন্তু তুমি... থামলো বনহুর।

মনিরা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

বনহুর বলে—মনিরা, আমি জানতাম লোভ-মোহ তোমাকে কোনো-দিন দুর্বল করবে না। আমি সত্যি গর্ব অনুভব করছি। মনিরা, এসব ধনসম্পদ যা দেখছো তা আমারও নয়। আমি শুধু রক্ষক মাত্র। জানো মনিরা, এগুলো আমি কোথায় পেয়েছি আর কাদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছি?

না, আমি জানি না; আর জানবোই বা কি করে। বললো মনিরা।

বনহুর মনিরা সহ খাটে বসে পড়লো। ওর চুলগুলো কপাল থেকে আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো—এক সাঁপুড়ে সর্দারের সহযোগিতায় আমি এই ধনসম্পদ লাভ করেছি। গভীর পাতালপুরী থেকে এগুলো আমি উদ্ধার করেছিলাম নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে। মনিরা, এই ধনসম্পদ উদ্ধার করতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সে এক বিচিত্র কাহিনী...

তুমি বলবে আমাকে?

কিন্তু আজ নয়। মনিরা, কতদিন পর তোমাকে এমন নিভৃতে পেয়েছি......এখানে কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না। এমন কি আমার অনুচরগণও কেউ এখানে এই আস্তানার খোঁজ জানে না একমাত্র রহমান ছাড়া।

তুমি এসব ধনসম্পদ এখানে রেখেছো কেন?

যখন প্রয়োজন মনে করি তখন এসব নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দেই দুঃস্থ জনগণের মধ্যে।

এতেই তুমি তৃপ্তি পাও?

হাঁ মনিরা। এসব তো তাদেরই জন্য আমি মজুত করে রেখেছি। যক্ষের মত আগলে থাকি যেন এগুলো কোনো সময় অন্যায়ভাবে খরচ না হয়!

ওগো তুমি কত বড়, কত মহান......মনিরা স্বামীর বুকে নিজকে বিলিয়ে দেয়।

নির্জন ভূগর্ভে শুধু ওরা দুজন, পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি থেকে, শহরের কোলাহল থেকে দূরে অনেক দূরে!

❑

গভীর রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে শোনা যায় অশ্বপদশব্দ। পাহাড়িয়া পথের কঠিন মাটির উপরে প্রতিধ্বনি জেগে উঠে খট খট খট......

আস্তানার সবাই সজাগ হয়ে উঠে। তারা বুঝতে পারে সর্দার ফিরে আসছে।

নূরী উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছে।

রহমান কয়েকজন অনুচর সহ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমান্বয়ে তাজের পদশব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠে।

অল্পক্ষণেই পৌঁছে যায় বনহুর তার আস্তানায়।

বনহুর নেমে দাঁড়াতেই দু'জন অনুচর তাজকে ধরে ফেলে, নিয়ে যায় অশ্বশালার দিকে। বনহুর আর রহমান এগিয়ে চলে আস্তানার অভ্যন্তরে।

চলতে চলতে বলে বনহুর—আগামীকাল মন্থনার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো ভেবেছিলাম কিন্তু হলো না।

সর্দারের মুখের দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরলো রহমান।

বনহুর বললো—আজ এক নতুন সংবাদ জানতে পারলাম—মিস দিপালীকে কে বা কারা উধাও করেছে।

রহমান বিস্মিত কণ্ঠে বললো—মিস দিপালী উধাও, বলেন কি সর্দার!

হাঁ, কোনো এক চক্রান্তকারীদল তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। দিপালী মিঃ হেলালীকে সহায়তা করেছিলো তাঁর কাজে, এই হলো তার অপরাধ।

সর্দার, আমি সব জানি। শহরের বাইরে কোথাও চক্রান্তকারীদল আত্মগোপন করে আছে এবং সেখানে থেকে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর রহমানের কথায় বললো—শহরের বাইরেই শুধু তারা আস্তানা গাড়েনি রহমান, সেই শয়তান চক্রান্তকারীদল শহরের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে মিশে আছে এবং মহৎ ব্যক্তির মুখোশ পরে কার্যসিদ্ধ করে যাচ্ছে। এদের চিনতে কষ্ট হলেও খুঁজে বার করতেই হবে। দিপালীকে উদ্ধার না করে মন্থনায় যাওয়া সম্ভব হবে না।

রহমান নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো, বললো এবার—দিপালীর সন্ধানে আমাদের কিছু অনুচর পাঠাবো কি সর্দার?

হাঁ, এই মুহূর্তে কান্দাই শহরের সর্বত্র আমাদের অনুচর পাঠিয়ে দাও, কারণ আমার হাতে সময় অত্যন্ত অল্প। ঠিক সময় মন্থনায় পৌঁছতে না পারলে দস্যুরাণী সিমকীর প্রাণনাশে কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না। আমি চাই দিপালীকে উদ্ধার করে দস্যুরাণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবো। হাঁ, আরও কাজ রয়েছে আমাদের হাতে। দেশকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে, তবেই দেশে ফিরে আসবে শান্তি, স্বস্তি আর বেঁচে থাকার প্রেরণা।

বনহুর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে নূরী এসে দাঁড়ায় সম্মুখে, বলে—হুর, তুমি ফিরে এসেছো। এসো কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বনহুর বললো—চলো, কিন্তু বেশিক্ষণ তোমার কথা শোনার সময় করে উঠতে পারবো না নূরী।

জানি, আমার কথা শোনার সময় তোমার কোনোদিনই হবে না। অভিমানভরা কণ্ঠে কথাটা বলে নূরী এগুলো।

বনহুর এবার নূরীকে অনুসরণ করলো।

❑

দস্যুরাণী তার সুউচ্চ আসনে উপবিষ্টা থেকে বজ্রকঠিন কণ্ঠে তার অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো—দস্যু বনহুরকে তোমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছো?

দস্যুরাণীর অনুচরগণ মাথা নিচু করে রইলো। কেউ কোনো জবাব দিলো না।

দস্যুরাণী এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, মাটিতে পদাঘাত করে বললো—আমি আরও কয়েকদিন সময় দিলাম, তোমরা দস্যু বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে নচেৎ তোমাদের কারো রক্ষা নেই। জানি বনহুর এখন মন্থনায় নেই, সে ফিরে গেছে তার কান্দাই জন্মভূমিতে, রহমত!

বলুন রাণীজী?

তুমি মন্থনায় চলে যাও এবং সঙ্গে নিয়ে যাও কিছু অনুচর। যেমন করে হোক তাকে বন্দী করে আনতেই হবে, নাহলে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হবো না। আমি তাকে হীরা বাঈয়ের সম্মুখে হাজির করবো কেন সে তাকে এমনভাবে ধোঁকা দিয়েছে।

রাণীজী, চন্দনার জন্য কি......

হাঁ, ওর জন্য মৃত্যুদণ্ডই বাঞ্ছনীয় কিন্তু আরও দু'দিন পিছিয়ে দাও ওর মৃত্যুদণ্ডের তারিখটা। যাও এই মুহূর্তে তোমরা চলে যাও।

রহমত মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যায়। তাকে অনুসরণ করে তার সঙ্গীরা।

দস্যুরাণীর অনুচরবর্গ বেরিয়ে যেতেই দস্যুরাণী আসন গ্রহণ করতে যায়, ঠিক ঐ মুহূর্তে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এক জমকালো মূর্তি।

দস্যুরাণী চমকে না উঠলেও বিস্মিত হয়, কারণ তার ভূগর্ভ দরবার কক্ষে কে এই ব্যক্তি? দস্যুরাণী পা থেকে মাথা অবধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নেয় তারপর কঠিন কণ্ঠে বলে—কে তুমি?

জমকালো মূর্তি নিশ্চুপ, বরং আরও সরে আসে সে কয়েক পা।

দস্যুরাণী নির্ভীক কণ্ঠে বলে—কে তুমি জবাব দাও? আর এখানে এই দুর্গম ভূগর্ভ গুহাকক্ষে কিভাবে প্রবেশ করলে বলো?

জমকালো মূর্তি মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলতেই মশালের আলো এসে পড়লো তার মুখে। এতক্ষণ জমকালো মূর্তির মুখের নিচের অংশ তার পাগড়ির আঁচল দিয়ে আবৃত থাকায় তার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না।

এবার সম্মুখে সাপ দেখার মতই চমকে উঠে দস্যুরাণী, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—প্রদীপ কুমার!

না।

তবে কে তুমি?

যাকে বন্দী করার জন্য তুমি এই মুহূর্তে তোমার অনুচরগণকে কান্দাই পাঠালে।

দস্যু বনহুর!

হাঁ।

তুমি এখানে?

হাঁ দেখতেই পাচ্ছো।

দস্যুরাণী কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে, তারপর বললো—আশ্চর্য, প্রদীপ কুমার এবং তোমার মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে।

সে কারণেই তোমার অনুচরদের নিকটে নিজের অক্ষমতা গোপন করতে সক্ষম হয়েছিলো।

চুপ করো শয়তান!

শয়তান আমি নই রাণীজী, আমি কোনো শয়তানি করি না বা করিনি। একটু পূর্বে তুমি তোমার প্রধান অনুচরের নিকটে বলেছিলে তোমার বান্ধবী হীরা বাঈকে আমি ধোঁকা দিয়েছি, কাজেই তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করে তোমার বান্ধবীর সম্মুখে হাজির করবে?

হাঁ, আমি তোমাকে বন্দী করে...

কিন্তু তার পুর্বে শুনে রাখো রাণীজী, তোমার বান্ধবী হীরার আমি কোনো ক্ষতি করিনি।

ক্ষতি করোনি? তার সঙ্গে তুমি প্রেমের অভিনয় করোনি? কি অধিকার ছিলো তোমার তার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করার?

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠে ভীষণভাবে।

দস্যুরাণীর দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে, দস্যু বনহুরকে সে এমনভাবে দেখেনি। তাকে সে এমনভাবে একেবারে নিজের দরবারকক্ষে দেখবে, আশাও করেনি কোনো সময়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দস্যুরাণী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুরের হাসির শব্দ যেন চারপাশের দেয়ালে আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরে আসে দস্যুরাণীর কানে। অদ্ভুত সে হাসির শব্দ।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—কেউ যদি কাউকে জোরপূর্বক ভালবাসে তাকে বিমুখ করাটাও কারো পক্ষে সমীচীন নয়, তাই...

তাই তুমি হীরার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করেছিলে?

হাঁ, মিথ্যা নয় আমি তার সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম।

এ রকম অভিনয় তুমি কত জনার সঙ্গে করেছো দস্যু বনহুর?

বাহাদুর! চমৎকার একটি উপাধি লাভে সক্ষম হলাম রাণীজী।

জবাব দাও আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করেছি তার।

ঠিক আংগুলে গুণে বলা সম্ভব নয় রাণীজী, তবে অনুমান কয়েক শত হবে।

শুধু শত নয়, কয়েক হাজার বলা চলে।

তাও মিথ্যা নয়, কারণ প্রথমেই বলেছি আংগুলে গুণে বলা সম্ভব নয়।

জানো এটা তোমার কত বড় দোষ?

দোষ নয়—অপরাধ।

তবু তুমি...

নিরুপায় হয়ে।

কিন্তু কি অধিকার আছে তোমার এ মিথ্যা অভিনয় করার?

জানো, হীরাবাঈ আজও তোমার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে তোমাকে স্মরণ করে চলেছে।

এ আমার অপরাধ নয় রাণীজী, অপরাধ তোমার বান্ধবীর। কারণ সে তাদের ধর্ম বিরোধী কাজ করেছিলো। তাদের ধর্মে রয়েছে বিধবা নারীর পুরুষের মুখোদর্শন নিষিদ্ধ।

দস্যুরাণী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—হীরা বিধবা? কে—কে বললো তোমাকে এ কথা?

হাঁ, হীরা বিধবা এবং সে বাল্যবিধবা।

মিথ্যা কথা!

না, মিথ্যা নয়—অতি শিশুকালে সে তার স্বামীকে হারিয়েছিলো এবং সেই কারণেই তাকে সিন্ধিরাজ তার রাজঅন্তঃপুরের অভ্যন্তরে রাখতো যেন কোনোক্রমে কোনো পুরুষের সান্নিধ্যলাভে সে সক্ষম না হয়। এজন্য ছিলো তার উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা।

এত সব জানো তুমি?

আরও জানি, দিনের আলোতে তাকে কোনোদিন রাজঅন্তঃপুরের বাইরে আসতে দেওয়া হতো না। ভোররাতে যখন সমগ্র পৃথিবী ঘুমে অচেতন থাকতো তখন হীরা তার বান্ধবীদের নিয়ে সমুদ্রতীরে যেতো স্নান করতে। কিন্তু মহারাজের চোখে ধুলো দিয়ে রাজকন্যা হীরা তার ধর্ম বিরোধী কাজে মত্ত হয়েছিলো। সে আমাকে নিয়ে প্রেমাভিনয়ে মেতে উঠেছিলো চরমভাবে

না, তার সে প্রেম অভিনয় নয়, সত্যি সে তোমাকে ভালবেসেছিলো মনপ্রাণ দিয়ে।

কিন্তু সে যা করছিলো তা তার জন্য চরম অপরাধ ছিলো।

তুমি তার জন্য দায়ী, কেন তুমি তাকে বুঝতে দাওনি তোমার সান্নিধ্য মিথ্যা, তুমি তাকে ভালবাসোনি।

বলেছি, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে নেয়নি। রাণীজী, তুমি জানো না, আমি হীরাবাঈয়ের পিতাকে বাধ্য করেছিলাম তার কন্যাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে দিতে।

মিথ্যা কথা!

না সত্য।

হীরাবাঈকে তুমি দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েছিলে?

আকাশে সূর্য যেমন সত্য তেমনি সত্য হীরাবাঈয়ের দ্বিতীয় বিয়ে।

কিন্তু সে তার স্বামীকে মেনে নেয়নি। হীরা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো তোমাকে। তাই আমি চাই তুমি হীরাকে গ্রহণ করবে, নাহলে....

বলো, থামলে কেন রাণীজী?

তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দেবো।

হাঃ হাঃ হাঃ, মৃত্যুদণ্ড দেবে আমাকে?

হাঁ।

চমৎকার। তোমার বান্ধবীকে গ্রহণ না করলে তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। আর যদি তাকে গ্রহণ করি?

পুরস্কার পাবে।

পুরস্কার? কি পুরস্কার দেবে রাণীজী?

যা চাইবে।

সত্যি বলছো তো?

দস্যুরাণী কোনো দিন মিথ্যা বলে না।

তোমার সহচরী চন্দনার মুক্তি চাই।

মুহূর্তে দস্যুরাণীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো— অসম্ভব!

কেন?

সে জবাব তোমাকে দিতে আমি রাজি নই।

তবে তুমি যা বলছো আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

তোমাকে আমি বন্দী করবো।

কি বললে রাণীজী আমাকে তুমি বন্দী করবে?

হাঁ, তোমাকে আমি বন্দী করে ফেলেছি দস্যু বনহুর। কারণ, তুমি ইচ্ছা করলেও আর এই স্থান ত্যাগ করতে সক্ষম হবে না।

বনহুর হেসে বললো—তোমার সাধ্য কি আমাকে বন্দী করো...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, তার চার পাশে মুহূর্তে লৌহশিকের দেয়াল উঠে আসে। এত দ্রুত এই দেয়াল সৃষ্টি হয় যেন একেবারে ভৌতিক কান্ড।

বনহুর ভাবতেও পারেনি এমন একটা বেষ্টনী এখানে অদৃশ্যভাবে ছিলো।

এবার দস্যুরাণী হেসে উঠে খিলখিল করে, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলে—এবার কি করে পালাবে দস্যু বাহাদুর? শুনেছিলাম তোমাকে বন্দী করে এমন লোক এ বিশ্বে নেই, তাই আমি নিজে শপথ নিয়েছিলাম তোমাকে বন্দী না করা পর্যন্ত চন্দনাকে মুক্তি দেবো না।

বনহুর এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিলো দস্যুরাণীর কথাগুলো! সে তাকিয়ে দেখলো তার দেহের চারপাশে মজবুত লৌহশলাকা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোনো সাধ্য নেই সেই বেষ্টনী ভেদ করে বের হওয়ার।

বনহুর যখন নিজের চারপাশের লৌহশলাকা বেষ্টনী দেয়াল লক্ষ্য করছিলো তখন দস্যুরাণী করতালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন অনুচর প্রবেশ করে সেখানে।

অনুচরটি বন্দী দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে বিস্মিত হয় এবং মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।

দস্যুরাণী বলে—যাও রহমতকে ডেকে আনো। তার সঙ্গে চন্দনাকে নিয়ে এসো এখানে।

অনুচরটি অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর বলে উঠে—রাণীজী, তোমার তারিফ না করে পারছি না।

কারণ?

তোমার সুনিপুণতা ও বুদ্ধিবল আমাকে অভিভূত করেছে। তোমার কাছে আমি পরাজিত হলাম। কিন্তু মনে রেখো রাণীজী, তোমার বান্ধবী হীরার কাছে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

মনে রেখো দস্যুরাণীর অসাধ্য কিছু নেই। হীরাকে তুমি গ্রহণ না করলে তোমার মুক্তি নেই।

কিন্তু তার স্বামী আছে।

আমি জানি তার স্বামীকে সে কোনোদিনই স্বীকার করে নেয়নি।

তোমার বান্ধবীকে আমি ঘৃণা করি যদি সে সত্যই তার স্বামীকে স্বীকার না করে থাকে। কারণ স্ত্রী জাতির ধর্ম স্বামী......

সে তোমাকে স্বামীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

না, তা হতে পারে না, কারণ সে কোনোদিন আমার তরফ থেকে সে এ ধরণের কোনো ইঙ্গিত পায়নি।

আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি আমার বন্দী! বনহুর, এখন আমার জীবনের সার্থকতা এসেছে, এসেছে আমার আত্মতৃপ্তি। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে আমি আমার নিজের কাছে নিজে পরাজিত হয়েছিলাম একদিন, কারণ আমি ভুলবশতঃ বন্দী করে এনেছিলাম রাজকুমার প্রদীপকে। জেনেশুনে আমি একটি নিষ্পাপ তরুণকে আমার অন্ধ কারাকক্ষে বন্দী করে রেখেছিলাম। শুধু আমার অক্ষমতা যেন অনুচরদের কাছে প্রকাশ না পায়, এজন্যই আমি বাধ্য হয়েছিলাম এ কাজ করতে।

ও, তুমি তাহলে জানতে তোমার বন্দী আসলে রাজপুত্র প্রদীপ কুমার?

জানতাম, আর সেজন্যই আমি প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দস্যু বনহুরকে আমি বন্দী করবোই।

আজ তাহলে তোমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে রাণীজী?

হাঁ।

আমাকে বন্দী করে তুমি কি করতে চাও?

তোমার দস্যুতার বাহাদুরি ঘুচিয়ে দিতে চাই।

শুধু কি এই তোমার মূল উদ্দেশ্য?

না, তোমাকে আমার বান্ধবী হীরাবাঈকে উপহার স্বরূপ পাঠাবো।

চমৎকার!

কেন, হীরার মত মেয়ে কার না কাম্য। জানো সে শুধু রাজ-কুমারীই নয়, সে একজন অনন্যাসুন্দরী তরুণী। এমন নারীরত্ন লাভে কার না লোভ হয়?

লৌহ আবেষ্টনী মধ্যে বন্দী হয়েও বনহুর পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক রয়েছে। কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না বা হচ্ছে না তার মুখমণ্ডলে। দস্যুরাণীর কথায় বলে বনহুর—বেশ, আমি রাজি। তোমার বান্ধবী হীরাবাঈয়ের সন্তুষ্টির কারণে তুমি আমাকে ব্যবহার করতে চাও, এ আমার পরম সৌভাগ্য বলেই আমি মনে করছি।

বনহুর, ভেবোনা তুমি হীরাকে ফাঁকি দেবে।

মোটেই না! কেন, আমার কথার মধ্যে কি ঐ ধরনের কোনো ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়েছে রাণীজী?

তুমি বন্দী, কাজেই আমি তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই বনহুর।

বেশ, তাই হোক।

এমন সময় রহমত সহ চন্দনা এসে দাঁড়ায় সেই কক্ষে। যে অনুচরটিকে দস্যুরাণী এদের আনার জন্য পাঠিয়েছিলো সেও এসে দাঁড়ায় একপাশে।

রহমত এবং চন্দনা রাণীর সম্মুখে লৌহবেষ্টনী মধ্যে প্রদীপ কুমারকে জমকালো পোশাকে বন্দী অবস্থায় দেখে অবাক হয়। তারা রাণীকে কুর্ণিশ জানানোর কথাও ভুলে যায়। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফিরে তাকায় দস্যুরাণীর মুখে। তাদের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

দস্যুরাণী বুঝতে পারে রহমত এবং চন্দনা তার কৌশলে বন্দী শালার বন্দীকে দেখে বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়েছে। তাদের বিস্ময় দূরীকরণে দস্যুরাণী সজাগ হয়ে উঠলো। বললো সে—রহমত, যাকে আমার কৌশলে বন্দীশালার বেষ্টনীমধ্যে বন্দী দেখতে পাচ্ছো সে মন্থনার রাজপুত্র প্রদীপ কুমার নয়।

রহমত বলে উঠে—তবে কি......

হাঁ, সম্মুখে বন্দী অবস্থা যাকে লক্ষ্য করছো তাকেই আমি সন্ধান করে ফিরছিলাম এবং তোমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম কান্দাই গিয়ে তাকে খুঁজে বের করো।

তাহলে......

হাঁ, এই সেই যার জন্য চন্দনাকে আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর অভিনয় করেছি।

বলে উঠে চন্দনা—অভিনয়!

হাঁ, অভিনয়। চন্দনা, তুই ভাবতে পারলি আমি তোকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলাতে পারি? আমি তোর উপর মৃত্যুদন্ডাদেশ দিতে পারি?

তবে যে তুমি...

হাঁ, সব ছিলো আমার নিপুণ এক কৌশল। জানতাম, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার সাধ্য কারো নেই। আমার অনুচরদের উপর যদিও আমি তাকে গ্রেপ্তার করে আনার কঠিন আদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তারা কিছুতেই সক্ষম হবে না এও জানতাম। তাই আমি তোর মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই এ সংবাদে নিশ্চুপ থাকতে পারবে না। কারণ সে জানতো, আওরঙ্গকে আশ্রয় দিয়েছিলো চন্দনা এবং সেই অপরাধে তাকে হত্যা করা হচ্ছে, কাজেই ...এবার সব বুঝতে পেরেছো তোমরা। আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। আমি জয়যুক্ত হয়েছি।

চন্দনা রাণীর বুকে মাথা রেখে বলে উঠে—সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী রাণী—সত্যি তুমি অদ্বিতীয়া!

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। সে দস্যুরাণীর কথাগুলো সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো। বুঝতে পারলো, তাকে বন্দী করার এক চরম কৌশল এঁটেছিলো দস্যুরাণী।

বললো এবার দস্যুরাণী—কি ভাবছো দস্যু বাহাদুর?

ভাবছি তোমার কৌশল ও বুদ্ধির কাছে আমি হেরে গেলাম।

স্বীকার করো এ কথা?

না করে উপায় কোথায়। যাক, তবু সিমকীর জন্য তুমি মৃত্যু দণ্ডাদেশ সত্যি কার্যকরী করোনি, সে ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করছি।

সিমকীর জন্য তোমার অপরিসীম অনুভূতি ছিলো এবং আছে, কারণ তার স্বল্পবুদ্ধির সুযোগ নিয়েই তুমি আমার দুর্ভেদ্য ভূগর্ভ ঘাটির অভ্যন্তরে প্রবেশে সক্ষম হয়েছিলে।

সে কারণেই আমি নিজকে সৌভাগ্যবান মনে না করে পারিনি, যেহেতু এমন সুযোগ গ্রহণ সব সময় ভাগ্যে আসে না। সিমকীর অভিনয় আমাকে অভিভূত করেছিলো। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুরের মুখের দিকে।

চন্দনা কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো দস্যু বনহুরের মুখের দিকে। তার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও চেহারা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। এই সেই আওরঙ্গ, এটা যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

দস্যুরাণী বুঝতে পারলো, চন্দনা আত্মহারা হয়ে পড়েছে। তাকে সজাগ করে তোলার জন্য বললো—চন্দনা, এবার তুমি যেতে পারো।

চন্দনা দস্যুরাণীর কথায় চমকে উঠলো, কারণ সম্বিৎ ফিরে এলো তার মধ্যে। একটু লজ্জিতও হলো সে ভিতরে ভিতরে। দস্যুরাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো চন্দনা সেই কক্ষ থেকে।

দস্যুরাণী এবার রহমতকে লক্ষ্য করে বললো—তুমিও যাও, রায়হান আস্তানায় জানিয়ে দাও আমার কাজ হাসিল হয়েছে।

বেরিয়ে যায় রহমত।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বনহুর বলে—রাণীজী, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। যা সম্ভব নয় তুমি কৌশলে তা সম্ভব করেছো কিন্তু আমাকে আটকে রাখার মত শক্তি তোমার হবে না, এটাও জেনে রেখো রাণীজী। এ প্রচেষ্টা তোমার ব্যর্থতাই প্রমাণ করবে শেষ পর্যন্ত।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—আমার বন্দীশালা থেকে বের হওয়ার মত দুরাশা তোমার মনে দানা বেঁধেছে দেখে সত্যি আমি বিস্মিত না হয়ে পারছি না।

হেসে বললো বনহুর—তার প্রমাণ প্রদীপ কুমারের মুক্তিলাভ, এটা কি স্মরণ আছে রাণীজী?

অধর দংশন করে বললো দস্যুরাণী—আমার ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য আমি অনুতপ্ত না হয়ে নিজকে এ ব্যাপারে আরও সজাগ করে নিয়েছি। যার জন্য তোমার কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার।

কথাটা বলে দস্যুরাণী তার সুউচ্চ আসনের উপরে গিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে পাদানিতে পা রেখে চাপ দিতেই সম্মুখস্থ লৌহশলাকা বেষ্টিত বন্দী শালা সহ বনহুর অদৃশ্য হলো।

দস্যুরাণী হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে।

❑

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলো শয়তানের দল? বলো আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে এলে? যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললো দিপালী।

সমস্ত শরীরে বেত্রাঘাতের কঠিন স্পষ্ট ছাপ। এলায়িত রুক্ষ তৈলহীন চুল। ছিন্নভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র। জামাটা ছিঁড়ে পিঠের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। ঠোঁটের পাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দুটো বসে গেছে হবে। চোখের দৃষ্টি সচ্ছ নয়, কেমন যেন ঘোলাটে, কারণ ক'দিন সে অনাহারী।

দু'জন বলিষ্ঠ পুরুষ তার দু'বাহু ধরে টেনে হিঁচড়ে এনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো আধো অন্ধকারময় একটি কক্ষে।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয়ের একজন বললো—এবার এখানে থাকো। যেমন কাজ করেছিলে তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করো।

দরজা বন্ধ করে চলে গেলো ওরা।

দিপালী শুকনো, কঠিন মেঝেতে মৃতবৎ পড়ে রইলো। আজ কয়েকদিন হলো সে বন্দী হয়েছে, তারপর থেকে তার উপর চলেছে নির্মম অত্যাচার অনাচার উৎপীড়ন। সমস্ত দিন ধরে তার উপর চলে নিষ্পেষণ, সন্ধ্যায় তাকে একটি নোংরা অন্ধকার কক্ষে রেখে যাওয়া হয়। তখন তাকে শুধু একটি শুকনো রুটির টুকরা খেতে দেওয়া হয়। তবু সে একা নয়, কয়েকটা কুকুর ছিলো তার সঙ্গী। যখন তাকে খাবার দেওয়া হতো তখন ছুটে আসতো ক্ষুধার্ত কুকুরের দলটি।

দিপালী কোনোদিন পেতো কোনোদিন পেতো না। যদিও এক টুকরা রুটি দিয়ে তার উদর পূরণের কোনো সম্ভবনাই ছিলো না, তবু ক্ষুধা নিবারণের উৎকট প্রচেষ্টা চালাতো সে।

প্রথম প্রথম দিপালীর খুব খারাপ লাগলেও পরপর ব্যাপারটা যেন গা সওয়া হয়ে গিয়েছিলো তার। কুকুরগুলোকে ভীষণ ভয় করতো সে, কিন্তু এখন আর তেমন ভয় করে না। আর ভয় করেই বা কি হবে, এরাই যে তার এখন সাথী।

কুকুরগুলোও প্রথম দিন অবাক হয়ে গিয়েছিলো তাদের নতুন এক সহচর দেখে। দিপালীকে লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ করেছিলো খানিকক্ষণ ভীষণভাবে। দিপালী সহায় করুণ চোখে তাকিয়ে দেখছিলো, সে ভাবছিলো হয়তো ঐ ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো তাকে কাঁমড়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু কুকুরগুলো কিছুক্ষণ অবিরাম চিৎকার করলেও এক সময় তারা বুঝতে পারলো সেও তাদেরই একজন। কাজেই এক সময় ওরা নীরব হয়ে গিয়েছিলো কতকটা অনিচ্ছা সত্বেও।

দিপালীও যেন ওদের মেনে নিয়েছিলো বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে। এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে বারবার তাকাচ্ছিলো কুকুরগুলোর দিকে ওরা যেন ক্রমান্বয়ে তাকে সহ্য করে উঠবার চেষ্টা করছে।

হলোও তাই দিপালীকে কুকুরগুলো যেমন সঙ্গী হিসাবে মেনে নেবার চেষ্টা করে চলেছে তেমনি দিপালী নিজকেও ওদেরই একজন মনে করে নিয়ে চুপচাপ ছিলো। আর চুপ না থেকেই বা কি করবে— দশের এবং দেশের উপকার করতে গেলে এমনি নানা বিপদ আপদের সম্মুখীন হতেই হবে, এ কথা তার অজানা ছিলো না। আর ছিলোনা বলেই সে ব্যাপারে পা বাড়িয়েছে।

সমস্ত দিনটা তার কাটলো কুকুরগুলোর সঙ্গে। দিপালী প্রথম দিন ভেবেছিলো তাকে এমনি করে কুকুরগুলোর সঙ্গে আটকে রাখা হবে, হয়তো বা এই তার চরম শাস্তি। কিন্তু কয়েক ঘন্টা যেতে না যেতেই তাকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সেই কক্ষটা থেকে।

দিপালী সেদিন ভেবেছিলো হয়তো কুকুরগুলোর সঙ্গে এটাই তার প্রথম এবং শেষ দেখা। তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও জানে না দিপালী তখন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো সবকিছু। উপলব্ধি করলো তাকে এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে ঐ কুকুরগুলোর মতও সহানুভূতিশীল হৃদয় নেই।

একটা বেশ বড়সড় ঘরে আনা হয়েছিলো সেদিন দিপালীকে। যদিও তখন রাতই ছিলো তবু ইলেকট্রিক আলোতে সব দেখতে পাচ্ছিলো সে ভালোভাবে। মূল্যবান জামা কাপড় পরিহিত মুখোসধারী কয়েক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত রয়েছে দেখেছিলো দিপালী। ভেবেছিলো কুকুরগুলোর পরিবর্তে এবার কিছু মানুষ তার সঙ্গী মিললো।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দিপালী বুঝতে পারলো, ঐ কুকুরগুলোর চেয়েও এই দু' পা-ওয়ালা জীবগুলো ভয়ঙ্কর এবং জঘন্য।

দিপালী যখন পুনরায় তার পূর্ব পরিচিত চতুষ্পদ জীবগুলোর মধ্যে ফিরে এলো তখন সে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার সমস্ত দেহটা যেন চলৎশক্তিহীন অসাড় হয়ে পড়েছে। দু' পা-ওয়ালা জীবগুলো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো যেমনভাবে তাতে দিপালীর পক্ষে বেঁচে থাকাটাও যেন আশ্চর্য ছিলো।

যখন তার সম্বিৎ ফিরে এসেছিলো তখন সে দেখেছিলো নিজকে এক বীভৎস অবস্থায়। দেহে তার কোনো বস্ত্র ছিলো না, ছিলো না আবরণ জাতীয় কোন সম্বল। নিজের বিধ্বস্ত দেহটাকে দেখে শিউরে উঠেছিলো। এর চেয়ে চিরনিদ্রা তার জীবনে ছিলো পরম কাম্য।

কিন্তু জীবনটা যত হালকা মনে হোক আসলে তা নয়। দিপালীকে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়েছিলো।

সে কি অট্টহাসির হুল্লোড়।

দিপালী চোখ তুলতেই দেখতে পেয়েছিলো সেই দু পা-ওয়ালা জীবগুলোকে, যারা তার এ অবস্থা করেছে। মানুষ হলে ওরা এমনভাবে হাসতে পারতো না। কুকুরগুলোও না, এরা কুকুরগুলোর চেয়েও জঘন্য কোনো এক নাম না জানা জীব হবে। সত্যি সত্যি দিপালীর তখন তাই মনে হচ্ছিলো।

দিপালীর খুব কান্না পেয়েও সে কাঁদলো না। সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো, পাশে তাকালো, কারণ তার দেহখানা সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। হয়তো বা নিজের দেহখানাকে সে ঐ দু'পা-ওয়ালা জীবগুলোর শ্যেন দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখতে চাইলো। হঠাৎ নজরে পড়লো ওপাশে তারই পরিধেয় বসনগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে।

দিপালী অবাধ্য শিশুর মত ছুটে গেলো তার নিজের জামা কাপড়গুলো নেবার জন্য কিন্তু সে ঐ কাপড়গুলোর সম্মুখে পৌছবার পূর্বেই একজন দু'পা ওয়ালা জীব তুলে নিলো কাপড়গুলো হাতের মুঠায়।

দিপালী অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরলো লোকটাকে—দাও, আমার কাপড় দাও...

অট্টহাসি ভেসে এলো দীপালীর চারপাশ থেকে। হাসি তো নয় যেন এক একটা গনগনে সীসার বুলেট। তার দেহখানাকে যেন ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিলো।

দিপালী দু'হাতে নিজের দেহটাকে জড়িয়ে ধরে বসে পড়েছিলো এক অসহায় করুণ অবস্থায়।

চারদিকে কুৎসিত অট্টহাসির শব্দ।

একজন ডেকেছিলো, এই নাও তোমার পরিধেয় বস্ত্র। নিয়ে যাও সুন্দরী...

দিপালী বিশ্বাস করে উঠে দাঁড়ায়, পা বাড়াতেই লোকটা কাপড় খানা ছুঁড়ে দেয় অপর এক দু'পা-ওয়ালা জীবের দিকে।

দিপালী ছুটে যায় কাপড়খানা ধরার জন্য।

সেই সময় আবার শুনতে পায় সেই কুৎসিত হাসির শব্দ। দিপালী যেন মরিয়া হয়ে উঠে।

ওকে নিয়ে বেশ কিছু সময় চলেছিলো এক অভিনব কুৎসিত তামাশা। দিপালী তবু মরেনি, মরতে পারেনি কোনোক্রমে সেদিন। কুকুরগুলোর পাশে ফিরে এসে কতকটা আশ্বস্ত হলেও সমস্ত দেহটা যেন ওর জ্বালা করছিলো অসম্ভব রকম। একটা কোনো কিছু করবার উপায় থাকলে এ প্রাণ সে অনেক্ষণ নিঃশেষ করে ফেলতো যেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে তার নারীত্ব।

কুকুরগুলোকে বন্ধুর চেয়ে কম মনে হয়নি সেদিন, কারণ ওরা দু'-পা-ওয়ালা জীবগুলোর মত ভয়ঙ্কর নয়। ওদের কাছে দিপালীর ভরসা আছে।

দিপালী তাকিয়ে ছিলো ওদের দিকে, দেখতে পেয়েছিলো ওরা কেমন সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে সম্মুখের দু'খানা পায়ের মধ্যে মুখ রেখে। ওদের দিকে তাকিয়ে অনেকটা ভরসা পেয়েছিলো দিপালী সেদিন।

এরপর থেকে প্রতিদিন দিপালীকে ওরা নিয়ে যেতো এবং ওর উপরে চালাতো নানা রকম অত্যাচার। কারণ সে দুস্কৃতিকারী চোরা চালানীদের সন্ধান দিয়েছিলো পুলিশ মহলে এটাই হলো তার অপরাধ।

ক্রমে দিপালী নেতিয়ে পড়েছিলো। প্রতিদিন তাকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হতো। বেত্রাঘাতে জর্জারিত করা হতো তার নিটোল সুন্দর দেহটাকে। কুকুরগুলো আজকাল দিপালীর বন্ধুর চেয়েও আপন বনে গেছে। এখন তাকে

দেখলে ওরা উৎকট আওয়াজ করে না বরং লেজ নেড়ে তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়।

দিপালী তাই মাঝে মাঝে নিজের শুকনো রুটির টুকরো থেকে কিছুটা ছিঁড়ে কুকুরগুলোর মুখে গুঁজে দেয়, কিছুটা খায় সে নিজে। কোনো রকমে জীবটাকে জিইয়ে রাখে, না রেখে তো কোনো উপায় নেই। প্রাণটা বড় শক্ত, বেরুতে চায় না সহজে।

আজকাল কুকুরগুলোও যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে, হয়তো স্বল্প খাওয়ায় ওদের তৃপ্তি ঘটে না! যেমন দিপালীর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আর কতদিন দিপালী এমনভাবে এই নির্যাতন সহ্য করবে! কুকুরগুলোকে আজকাল তার বড় ভাল লাগে, নিঃসঙ্গ জীবনের ওরা যেন সাথী-সঙ্গী। যখন দিপালী ফিরে আসে কুকুরগুলোর মধ্যে তখন সে অনেকটা সান্ত্বনা খুঁজে পায়। ওর মনে হয়, পশুদের মধ্য হতে এতক্ষণে বুঝি সে মানুষের মধ্যে ফিরে এলো।

দিপালী মেঝেতে কিছুক্ষণ মৃতের ন্যায় পড়ে রইলো। আজ তার উপর চলেছে অকথ্য অত্যাচার, নিপীড়ন যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাকে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কতকগুলো জটিল প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে যার জবাব দিতে সে হিমসিম খেয়ে গেছে। এছাড়া নতুন এক প্রস্তাব তার কাছে ওরা পেশ করেছে যা তাকে একেবারে মুষড়ে ফেলেছে। দু'পা-ওয়ালা জীবগুলো দিপালীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, তুমি যদি আমাদের কাজে সহায়তা করবে বলে শপথ গ্রহণ করো তাহলে তোমার উপর আমরা সহানুভূতি জানাবো এবং তুমি হবে তখন আমাদেরই একজন। দিপালী রাজি হয়নি, তাই তার উপর আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে তিনগুণ বেশি অত্যাচার চলেছে। দেহের কোনো কোনো স্থানে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকার সেক দেওয়া হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত ওর দেহ, দেহের কোনো কোনো স্থানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়ে রক্ত ঝরছে।

অনেকক্ষণ দিপালীকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে দেয়ালের পাশে ঝিমিয়ে পড়া কুকুরগুলো এগিয়ে আসে। সহানুভূতি জানিয়ে লেজ নাড়তে

থাকে ওরা—যেন বলছে, দুঃখ করোনা বোন, ন্যায়ের পথে জীবন বিলিয়ে দেওয়াতেও আত্মতৃপ্তি আছে।

নিঃশ্বাসের শব্দে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকায় দিপালী। এই নির্জন কারাকক্ষে কে এলো তার পাশে। চোখ মেলতেই অবাক হয় দিপালী দেখতে পায় কুকুরগুলো যারা এতক্ষণ ঐ দেয়ালের পাশে অন্ধকারে দু'পায়ের মধ্যে মুখ রেখে চুপচাপ শুয়েছিলো, তারাই উঠে এসেছে। দিপালীর নির্যাতিত করুণ অসহায় অবস্থা তাদের মনকে হয়তো ব্যথাকাতর করে তুলেছে, তাই ওরা নিশ্চুপ থাকতে চাইলেও পারেনি, ভাষাহীন মুখে সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে এসেছে, যদি ওদের কিছু করবার থাকতো তবে না করে পারতো না।

☐

দিপালী যখন অন্ধকারাকক্ষে কয়েকটি কুকুরের সঙ্গে একত্রে কাল যাপন করছে তখন পুলিশ মহল দিপালীর সন্ধানে সমস্ত কান্দাই শহর চষে ফিরছে। যেখানেই সন্দেহ হচ্ছে সেখানেই তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে কিন্তু সব জায়গায় তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

শুধু পুলিশ মহলই নয়, রহমান তার দলবলকে ছড়িয়ে দিয়েছে শহরের সর্বত্র। কোথায় আছে দিপালী, কোথায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিভাবে তাকে আটকে রাখা হয়েছে কিংবা তাকে হত্যা করা হয়েছে কিনা, সবকিছুর সন্ধান করে চলেছে ওরা তন্ন তন্ন করে।

দিপালীর নিরুদ্দেশ বনহুরকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো, সে তাকে খুঁজে বের করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগও নিয়েছিলো কিন্তু সময় হলো না। মন্থনা থেকে জরুরি এক সংবাদ পেয়ে বনহুরকে তখনই চলে যেতে হয়েছিলো। বনহুরের শপথ সিমকীকে রক্ষা করা।

বনহুর মন্থনায় রওয়ানা দেবার মুহূর্তে দিপালীকে খুঁজে বের করার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার রহমানের উপর তুলে দিয়ে গেছে।

রহমান তার চেষ্টার ক্রটি করেনি।

বনহুর মন্থনায় চলে যাবার পর কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি দিনের জন্যেও রহমান তার কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর এক মুহূর্ত বিশ্রাম না করে সদাসর্বদা দিপালীর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে। চতুর্থ দিনে তারা যখন ফিরে এলো তখন নূরী এসে দাঁড়ালো তাদের সম্মুখে! রহমান ও তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করেই সে বুঝতে পেরেছিলো কাজ সমাধা হয়নি। দিপালীকে তারা নিশ্চয়ই খুঁজে পায়নি। কারণ তাদের মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো একটা হতাশা আর ব্যর্থতার ছাপ।

নূরী জিজ্ঞাসা করলো—রহমান, দিপালীর কোনো খোঁজ পেলে?

রহমান বসে পড়লো একটা পাথরখণ্ডে। ক্লান্তভাবে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে শুষ্ককণ্ঠে বললো—সর্দারের নির্দেশমত কাজ করেছি কিন্তু কোনো ফলই হলো না!

নূরী বললো—আমার মনে হয় তোমাদের সন্ধান করাটা ঠিকমত হচ্ছে না। আমাকে অনুমতি দাও আমি যাবো দিপালীর খোঁজ করতে।

রহমান বললো—নূরী, তুমি তাকে কোনোদিন দেখোনি, তার সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কেমন করে তুমি তাকে খুঁজে বের করবে?

তবু কথা দাও কাল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে! বলো রহমান ভাই?

বেশ, কথা দিলাম।

নূরী যেন আশ্বস্ত হলো অনেকটা। দিপালী সম্বন্ধে সে বনহুরের মুখে কিছু কিছু জানতে পেরেছিলো, মেয়েটি বড় অসহায়। এ কথাও নূরী শুনেছিলো। তাই ওর প্রতি একটা আন্তরিক সহানুভূতি জেগে উঠেছিলো তার মধ্যে।

নারীর প্রতি নারীর যে একটা অন্তরের টান আছে, এ কথা কোনো নারীই অস্বীকার করতে পারবে না। হয়তো এ কারণেই নূরীর প্রাণ দিপালীর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো।

পরদিন রহমান আস্তানার বাইরে পা বাড়াতেই একটি তরুণ এসে তাকে অভিবাদন জানালো।

রহমান চমকে উঠলো ভীষণভাবে কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু হেসে বললো—নূরী; যত ছদ্মবেশই ধারণ করো আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। যেতে যখন চাইছো তখন নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি নিয়ে না গেলেও আমি তোমাকে অনুসরণ করতাম।

জানিনা তার ফল কি হবে।

তুমি আমার জন্য কিছু ভেবো না, আমি বনহুরের মুখে দিপালী সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি তাতেই আমি আমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবো।

বেশ, চলো।

রহমান আর নূরী আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এলো, দূটো অশ্ব পাশাপাশি অপেক্ষা করছিলো। একটি অশ্বে রহমান অপর অশ্বে নূরী চেপে বসলো।

কান্দাই জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে ওরা দু'জন।

বেলা দ্বিপ্রহর হলেও সূর্যের আলো তেমন প্রবেশ করে নি এ বনে। বহুকালের পুরোন নাম না জানা বিরাট বৃক্ষগুলো এক একটা দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

গহন বনের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে দূরে অনেক দূরে লোকালয়ের দিকে। ঐ পথ ধরে কোনোদিন কোনো পথিক কান্দাই জঙ্গলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, হয়তো করবেও না কোনোদিন। এ পথ শুধু তাদেরই যারা কান্দাই জঙ্গলের আদি বাসিন্দা।

বনহুর এ পথে চলে।

চলে তার অনুচরগণ আর চলে জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তুগুলো।

রহমান আর নূরীর অশ্বপদশব্দ ক্রমান্বয়ে মিশে যায় কান্দাই জঙ্গলের গহ্বরে।

দস্যুরাণীর কারাকক্ষ।

কৌশলে বনহুরকে বন্দী করেছে দস্যুরাণী। এত সহজে তাকে বন্দী করতে পারবে ভাবতে পারেনি সে। দস্যুরাণী তার অনুচরদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে, দীর্ঘ এক সপ্তাহব্যাপি মন্থনা আস্তানায় আনন্দোৎসব চলবে।

যে দস্যু বনহুরকে পুলিশ মহল বন্দী করতে সক্ষম হয়নি, যে দস্যু বনহুরকে ষড়যন্ত্রকারী দল আটক করতে পারেনি, যাকে বন্দী করার মত দুঃসাহস হয়নি জবরু সর্দারের, যাকে আটক রাখতে পারেনি হাঙ্গেরী কারাগার, মায়াচক্রীর মায়াজাল যাকে সম্মোহিত করতে পারেনি সেই দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুরকে অতি সহজে অতি কৌশলে বন্দী করেছে দস্যুরাণী। এ শুধু তার জীবনে চরম জয়লাভই নয়, পরম সৌভাগ্য। বিশ্ববাসী জানবে দস্যুরাণী কত শক্তিমান কত বুদ্ধিমতী নারী।

দস্যুরাণী দরবারকক্ষ থেকে ফিরে এলো তার বিশ্রামকক্ষে। পাশে চন্দনা তার পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে এলো।

দস্যুরাণী মুখের কালো আবরণ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে পড়লো একটা সোফায়। আনন্দসূচক শব্দ করে বললো—চন্দনা, জীবনে এমন সার্থকতা কমই এসেছে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে আমি বিশ্বে নতুন এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছি।

সত্যি তুমি বুদ্ধিমত্তায় অদ্বিতীয়। কোনো শক্তি যাকে বন্দী করে রাখতে পারেনি তুমি তাকে বন্দী করেছো। তোমাকে কি করে যে অভিনন্দন জানাবো......

থাক, অত বাহবা চাই না। শোন্ একবার ঐ বিশ্ববিখ্যাত দস্যুটার কারাকক্ষে যাবো।

সর্বনাশ!

ভয় হচ্ছে নাকি?

রাণী, তুমি পাশে থাকতে ভয় বলে কিছু জানি না। কিন্তু ওকে দেখলে আমার যেন কেমন মনে হয়।

চন্দনা, তুই দস্যুরাণীর সহচরী তোর মন নড়বড়ে হলে চলবে না। কঠিন হতে হবে তোকে। একটু হেসে বলে—ওকে বুঝি তোর খুব পছন্দ হয়?

যাও রাণী, যা তা বলো না।

তবে যে বলেছিলি ওকে দেখলে মন তোর কেমন করে।

রাণী, তুমি কি বলতে চাও আমি ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবো?

মুগ্ধ নয় চন্দনা, অভিভূত......

যাও।

অসম্ভব কিছুই নয় চন্দনা। দস্যু বনহুরের যে রূপ তাতে যে কোনো নারী অতি সহজেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

তুমি কি বলতে চাও তোমার আহাদ চৌধুরীর চেয়েও বনহুর বেশি সুন্দর?

হেসে উঠে দস্যুরাণী—অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিস চন্দনা।

সত্য করে বলো তো?

যার প্রিয়তম তারই কাছে সে সবচেয়ে বেশি সুন্দর। যাক বন্দীকে নিয়ে বেশি আলোচনা না করাই শ্রেয়। একটু থেমে বলে—চন্দনা!

বলো?

সত্যি কি হীরাবাঈ বাল্য বিধবা?

আমি জানি দস্যু বনহুর মিথ্যা বলে না।

তবে সে আমার কাছে কেন এসব কথা গোপন করেছিলো?

হয়তো কোনো কারণ ছিলো।

বনহুর বলেছে তাকে সে দ্বিতীয় বার বিয়েও দিয়েছিলো।

হাঁ, সে কথাও সত্য।

কিন্তু হীরা যে দস্যু বনহুরের প্রেমে আত্নহারা।

রাণী, শুনেছি দস্যু বনহুরকে যে একবার দেখেছে সেই তাকে ভালবেসেছে। জানি না তার মধ্যে কি একটা যাদু লুকানো আছে।

চন্দনা।

বলো?

এটুকু মনে রাখিস্ আমার কারাকক্ষ থেকে সে আর বাইরে যেতে সক্ষম হবে না। তাকে আমি আজীবন আটকে রাখবো যেন সে কোনো নারীর মন নিয়ে খেলা করতে না পারে।

তাহলে তুমি হীরাবাঈকে উপহারস্বরূপ ওকে দেবেনা?

না।

কেন?

হীরা মিথ্যা কথা বলেছে আমার কাছে। যে বিবাহিতা তার পক্ষে অপর এক পুরুষকে ভালবাসা অপরাধ, শুধু অপরাধই নয় মহাপাপ। দস্যু বনহুর ঠিকই বলেছে, হীরাবাঈ যা কামনা করে তার কোনোদিনই সম্ভব নয়। চল যাই, ওকে দেখে আসি এখনও ওর সেই গর্ব আছে না নেতিয়ে পড়েছে।

চন্দনা ও দস্যুরাণী পা বাড়ালো কারাকক্ষের দিকে।

দুর্গম অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে একসময় পৌঁছে গেলো তারা কারাকক্ষের পাশে।

পথ দুর্গম হলেও দস্যুরাণী আর চন্দনা অতি সহজেই এই পথ অতিক্রম করে এসেছে। কারণ রাণীর এবং রাণীর সহচরদের জন্য অদ্ভুত এক লিফ্‌ট ছিলো। সেই লিফ্‌টে চেপে পেরিয়ে আসতে হয় দুর্গম পথটা।

রাণী এসে দাঁড়াতেই কারাকক্ষের প্রহরীদ্বয় অভিবাদন জানালো।

বনহুর তখন কারাকক্ষে বসেছিলো চুপচাপ। সমস্ত শরীরে তার লৌহশিকল বাঁধা। দস্যুরাণী এবং চন্দনার উপস্থিতি লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়ালো সে এবং অভিবাদন জানালো দেহখানাকে অর্ধানমিত করে। দস্যু বনহুরের অভিবাদনে দস্যুরাণী খুশি না হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, সিংহীর চোখের মত জ্বলে উঠলো তার চোখ দুটো।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো—তোমার অভিবাদন আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ তুমি আমার বন্দী।

হেসে বললো বনহুর—তুমি যখন আমার বন্দী হবে তখন তুমি যেন আমাকে সম্মান দেখাতে ভুলে না যাও, এ কারণে আমি.......

গর্জে উঠলো দস্যুরাণী—এত বড় স্পর্ধা তোমার—আমাকে তুমি বন্দী করবে, এ কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে?

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে বনহুর।

দস্যুরাণী এবং চন্দনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আজ তিনদিন বন্দী থেকেও যার মধ্যে আসেনি এতটুকু পরিবর্তন। পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক রয়েছে সে, অবাক না হয়ে পারে না যেন দস্যুরাণী। ভীষণ রাগ হয় ওর উপর।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বলে উঠে বনহুর—রাণীজী শুনলাম তুমি সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসবের আয়োজন করেছো? একটু থেমে বললো—আমাকে এই আনন্দোৎসবে যোগ দেবার সুযোগ দেবে না?

দস্যুরাণী বনহুরের কথায় আরও ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো, কোনো কথা না বলে সে চন্দনাসহ বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় একবার তীব্রভাবে তাকিয়ে দেখে নিলো দস্যুরাণী বনহুরকে।

দস্যুরাণী ফিরে গিয়ে তার দরবারকক্ষে হাজির হলো। তক্ষুণি সে ডাক দিলো তার প্রধান অনুচর রহমতকে।

ছুটে এলো রহমত হন্তদন্ত হয়ে, কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—কি হুকুম রাণীজী?

দস্যুরাণী বললো—বনহুরকে সমস্ত দিন কিছু খেতে দেবে না। সন্ধ্যায় তাকে একখানা রুটি শুধু খেতে দেবে। তারপর আনন্দোৎসব চলাকালে

তাকে তার বন্দীশালায় প্রতিদিন-একঘন্টা বেত্রাঘাত করবে। যেন বুঝতে পারে সে বন্দী......

আচ্ছা রাণীজী।

যাও তোমরা আনন্দোৎসব শুরু করে দাও। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায় রহমত।

দস্যুরাণী পায়চারী করতে থাকে।

চন্দনা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছিলো দস্যুরাণীকে। দস্যুরাণী মাঝে মাঝে অধর দংশন করছিলো।

চন্দনা বুঝতে পারছে, বনহুরের কথা সে সহ্য করতে পারছে না; তাই সে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

চন্দনা কোনো কথা বলার সাহস পেলো না, সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

দস্যুরাণী পায়চারী বন্ধ করে বললো—চন্দনা, এতবড় সাহস আমার সম্মুখে আমাকে বন্দী করবে বলে সে গর্বিত উক্তি উচ্চারণ করতে পারলো?

রাণী, তুমি মিছামিছি বেশি উত্তেজিত হচ্ছো। বন্দী অবস্থায় মানুষ উন্মাদসম বিবেচিত হয়। সে তখন বিকারগ্রস্তের মত যা তা উচ্চারণ করে থাকে। তুমি বন্দীর কথা গায়ে মেখো না।

আমি বনহুরকে বন্দী করে তার প্রতি কোনোরকম অনাচার করিনি। তবু সে......না, তাকে আমি সমুচিত শাস্তি দেবো। দস্যুরাণী রাগে ক্ষোভে অগ্নিবর্ণ ধারণ করে।

❑

দস্যুরাণী সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট।

পাশে দণ্ডায়মান চন্দনা।

রহমত এবং কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচরও রাণীজীর আসনের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

সম্মুখে নেচে চলেছে দু'জন নর্তকী।

সমস্ত দরবারকক্ষ আলোয় ঝলমল করছে। একদল অনুচর অদ্ভুত ধরনের বাজনা বাজিয়ে চলেছে।

দরবারকক্ষটি নাচেগানে ভরপুর।

দস্যুরাণীর দু'চোখে আনন্দের উচ্ছলতা। দস্যুরাণীর খুশিতে সবাই খুশি। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে, এটা তাদের কম গর্বের কথা নয়। দস্যুরাণীর পিছনে চাঁদোয়ায় অসংখ্য তারার ফুলের মত আলোর ফুলঝুরি ঝরছে। ঠিক দস্যুরাণীর পিছন অংশে মাথার পাশে চাঁদের আকারে বিরাট আকার আলোর বাল্ব জ্বলছে।

দস্যুরাণীর সমস্ত দেহে মণিমুক্তাখচিত পোশাক। কিন্তু শাড়ি গাগড়া বা সালোয়ার কামিজ নয়। প্যান্ট এবং আঁটসাট পোশাক। কতকটা শিকারীর ড্রেসের মত। পায়ে হাঁটু অবধি ভারী বুট। কোমরের বেল্টে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা এবং রিভলভার।

দস্যুরাণীর মাথায় ক্যাপ।

ক্যাপখানা দিয়ে মুখের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে।

অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দস্যুরাণীকে।

দস্যুরাণী যখন দরবারকক্ষে আসার জন্য সজ্জিত হচ্ছিলো, তখান চন্দনা হেসে বলেছিলো—রাণী, আজ তোমাকে অপূর্ব লাগছে। যদি মিঃ চৌধুরী আজ পাশে থাকতেন......

যাঃ তুই বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস্ চন্দনা।

সত্যি, কতদিন তুমি মিঃ চৌধুরীকে দেখোনি। ঠিক করে বলোতো, তোমার মন কেমন করছে না তাঁর জন্য?

মাথায় ক্যাপটা ঠিকমত বসিয়ে আয়নায় নিজকে লক্ষ্য করে দস্যুরাণী বলেছিলো—মনের কথা শোনার সময় আমার নেই। তবে হাঁ, মিঃ চৌধুরী একখানা চিঠি দিয়েছিলো কিন্তু আমি তার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনি।

চন্দনা বলেছিলো—তোমার ভারী অন্যায় হয়েছে। সব কাজের আগে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত ছিলো।

হেসে বলেছিলো দস্যুরাণী—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম, তাই......

এবার তো তোমার শপথ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছো, দস্যু বনহুর তোমার কারাগারে বন্দী। কবে যাবে বলো তো?

সময়মত যাবো।

কথাটা সংক্ষেপে শেষ করে দস্যুরাণী দরবারকক্ষের দিকে পা বাড়িয়েছিলো।

চন্দনাও নীরবে অনুসরণ করেছিলো ওকে।

দস্যুরাণীর দরবারকক্ষে প্রবেশ করলে তার অনুচরগণ একুশবার তোপধ্বনি করেছিলো।

যদিও পৃথিবীর তলদেশে চলেছিলো এ আনন্দোৎসব, তবু মন্থনার মাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো সবার অলক্ষ্যে বারবার।

দস্যুরাণী আসন গ্রহণ করার পর তোপধ্বনি শেষ হয়েছিলো।

খুশি হয়েছিলো দস্যুরাণী অনুচরদের এই মহানন্দ পরিবেশে যোগ দিয়ে। মন্থনার আস্তানায় এমন আনন্দোৎসব এই ছিলো প্রথম।

অপূর্ব এই উৎসব।

বনহুর কারাকক্ষে বসে শুনতে পাচ্ছিলো তোপধ্বনির ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজ। কারাকক্ষের লৌহ দেয়ালগুলো যেন থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। তার সঙ্গে ঝনঝন করে বেজে উঠছিলো বনহুরের দেহের শিকলগুলো।

বনহুর উপলব্ধি করেছিলো এ আনন্দ উৎসবের মহা হুল্লোড়। কারণ তার কারাকক্ষের প্রহরীরাও শরাব পান করে ঢলঢল হয়ে পড়েছে। কেউ বা গান গাইছে, কেউ বা নাচতে শুরু করেছে, আমার কেউ কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে শরাবের বোতলগুলো গড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে।

বনহুর মৃদু মৃদু হাসছিলো, কারণ সে জানে, তার অনুচরগণও তার অলক্ষ্যে এমনি করেই আনন্দে মেতে উঠে। তখন তারা ভুলে যায় সর্দারের কঠিন আইনকানুন। মনে পড়ে নিজ আস্তানার কাথা...সেবার কোনো এক আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছিলো তার অনুচরগণ। সারা দিনরাত অবিরত নাচগান আর বাজি-তামাশার রংবাজি চলেছিলো ভূগর্ভে। হঠাৎ বনহুর কোনো কারণে সেখানে গিয়ে পড়েছিলো। তখন অনুচরগণ ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলো, কারণ তারা শরাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো।

দস্যুরাণী যদি এসে পড়ে এই মুহূর্তে, তাহলে ঠিক এদের অবস্থা তেমনি হবে...

কিন্তু দস্যুরাণী তখন তার দরবারকক্ষে আনন্দোৎসবে আত্মহারা। ঠিক আত্মহারা নয়, কারণ আজ তার মনে বারবার জেগে উঠছিলো আহাদ চৌধুরীর কথাগুলো। "রাণী, তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, ঠিক সময়মত আসবে।" মনে পড়ে আরও অনেক স্মৃতি যা মিঃ চৌধুরীকে স্মরণ করিয়ে দেয় রক্তে আঁকা ম্যাপের সন্ধানে যখন মিঃ বার্ডের সঙ্গে মিঃ আহাদ চৌধুরী হিন্দোল জঙ্গল অতিক্রম করে চলেছিলো তখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিলো আহাদ চৌধুরীর সঙ্গে। ঠিক সাক্ষাৎ নয়, আড়াল থেকে দস্যুরাণী দেখেছিলো তাকে। মিঃ আহাদ চৌধুরী বিশ্ববরেণ ডিটেকটিভ। মিঃ বার্ডের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন তিনি তবে আপন ইচ্ছায় নয়, মিঃ বার্ডের অনুরোধে। মিঃ বার্ড পেয়েছিলেন একটি ম্যাপ। ম্যাপখানা ছিলো কালি বা রং দিয়ে আঁকা নয়, রক্ত দিয়ে আঁকা ছিলো সে ম্যাপখানা। দস্যুরাণীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে সে দিনের স্মৃতিগুলো। গহন জঙ্গলে তাঁবুর মধ্যে পাশাপাশি কয়েকজন বসে রক্তে আঁকা ম্যাপখানা দেখছিলেন। তাঁরা হলেন মিঃ বার্ড, মিঃ আহাদ চৌধুরী, আর ছিলো মিঃ বার্ডের একমাত্র কন্যা মিস ক্যাথলিন। দস্যুরাণী হিংস্র জীব থেকে আত্মরক্ষা করে অতি গোপনে এসে দাঁড়িয়েছিলো তাঁবুর বাইরে, একটি ছিদ্র দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছিলো তাঁবুর ভিতরটা। ঐ মুহূর্তে প্রথমেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো মিঃ আহাদ চৌধুরীর দিকে। যদিও তার লক্ষ্য হলো টেবিলের ম্যাপখানা। তাঁবুর মধ্যে আগুনের বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা তার ভাল লেগেছিলো। দস্যুরাণী জানতো, তার বাবা দস্যু মরেন এই ম্যাপখানার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। যেমন করে হোক ঐ রক্তে আঁকা ম্যাপখানা তার চাই। ম্যাপখানার গোপন রহস্য যে জানতো, আর জানতো বলেই সে পিছু নিয়েছিলো মিঃ বার্ডের। দস্যুরাণীও এসেছিলো ঐ ম্যাপখানা হস্তগত করার অভিসন্ধি নিয়ে কিন্তু মনোভাব পালটে গিয়েছিলো তার যখন সে মিঃ আহাদ চৌধুরীর মোহময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলো। দস্যুরাণী মিঃ চৌধুরীর তখন সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো।

হিন্দোল জঙ্গল ছিলো অতি ভয়ঙ্কর স্থান। দিনের বেলায় কোনোদিন সে জঙ্গলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতো না। শত শত বছর ধরে সেখানের মাটি দিনের আলো থেকে ছিলো বঞ্চিত।

এই গহন জঙ্গলেই ছিলো তখন দস্যুরাণীর বিচরণ। রুহীর পিঠে চেপে সে সারাক্ষণ চষে ফিরতো হিন্দোল বন থেকে কোহেন পর্বত। যে কোহেন পর্বতের একটি নিভৃত গুহায় মিঃ বার্ড পেয়েছিলো রক্তে আঁকা ম্যাপখানা। রাণীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে কোহেন পর্বতের সেই গুহাটি, যে গুহায় অর্ধমৃত এক ব্যক্তি ধুঁকছিলো মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। মিঃ বার্ডের মুখে কাহিনীটা শুনেছে দস্যুরাণী। রক্তে আঁকা ম্যাপ একটি কাহিনী, যে কাহিনীর পিছনে রয়েছে গভীর এক রহস্য। আজ নতুন করে রাণীর মনে সেই বহুদিন আগের স্মৃতিগুলো ছায়াছবির মত ভেসে উঠছিলো।

হঠাৎ রাণীর চিন্তাধারায় বাধা পড়ে।

সম্মুখে নর্তকীর নাচ থেমে যায়।

মুহূর্তে দস্যুরাণীর কানে ভেসে আসে একটি গম্ভীর কঠিন কণ্ঠস্বর— খবরদার, কেউ এক পা নড়বে না।

দস্যুরাণী তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার খুলে নিতে পারে না। তার পূর্বেই সে দেখতে পায় তার দরবারকক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে জমকালো একটি মূর্তি। জমকালো মূর্তির দু'হাতে দুটি আগ্নেয় অস্ত্র।

দস্যুরাণীর চোখ দুটো মশালের আলোতে জ্বলে উঠলো যেন।

কঠিন কণ্ঠে বললো রাণী—কে? কে তুমি?

জমকালো মূর্তির মুখমণ্ডলের অর্ধেক ঢাকা অবস্থায় ছিলো, তাই তার মুখ সম্পূর্ণ দৃষ্টি গোচর হচ্ছিলো না।

জমকালো মূর্তি পূর্বের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি কে সে পরিচয় পাবে পরে। এখন তোমরা সবাই আমার বন্দী, একচুল কেউ নড়বে না।

রহমত তাকালো দস্যুরাণীর মুখের দিকে, তার মনোভাব এখন কি করা কর্তব্য জানতে চায় সে। দস্যুরাণী জানে, এ মুহূর্তে জমকালো মূর্তিকে আক্রমণ করলে তার হস্তস্থিত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে কয়েকজনকে প্রাণ দিতে

হবে। দস্যুরাণী তাই কোনোরকম আদেশ না দিয়েই নিজে সুউচ্চ আসন ত্যাগ করে নেমে এলো।

দরবারকক্ষ নীরব।

একটি সূচ পতনের শব্দ ও শোনা যাবে।

দস্যুরাণী দৃঢ় পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো দরবারকক্ষের মেঝেতে, দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কেমন করে তুমি এই ভূগর্ভ দরবারকক্ষে প্রবেশ করলে বলো? ঠিক ঐ মুহূর্তে দস্যুরাণী ইংগিত করলো রহমত এবং অন্যান্য অনুচরকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো রহমত ও দলবল যারা এতক্ষণ দরবারকক্ষের আনন্দোৎসবে আত্মহারা হয়েছিলো তারা জমকালো মূর্তিটাকে।

শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

অবশ্য জমকালো মূর্তি আগ্নেয় অস্ত্র এই মুহূর্তে ব্যবহার করলো না! সে আগ্নেয়াস্ত্রে বাঁটের দ্বারা এক একজনকে ধরাশায়ী করে চললো।

সমস্ত দরবারকক্ষ একটি লড়াইক্ষেত্রে পরিণত হলো। দস্যুরাণী নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, কারণ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় দ্রুত প্রস্তুতি নিতে পারেনি কিংবা অনুচরদের নির্দেশ দেবার সুযোগ পায়নি।

আশ্চর্য হয়েছে দস্যুরাণী, দরবারকক্ষের জ্বলন্ত মশালগুলো নিভে গেলো দপ দপ করে।

সমস্ত দরবারকক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। দস্যুরাণীর অনুচরগণও কেউ গুলি ছুঁড়তে পারলো না, কারণ শত্রু একজন আর সমস্ত দলবল তারা নিজেরাই। গুলি ছুঁড়লে মরবে নিজেরাই তাই তারা শুধু ধস্তাধস্তি করে চলেছে।

কিছুই দৃষ্টি গোপন হচ্ছে না দস্যুরাণীর।

সব নিকষ অন্ধকার।

শুধু আর্তনাদ আর ধস্তাধস্তির শব্দ।

দস্যুরাণী যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে, সে ভাবতেই পারেনি এমন ধরনের একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে, বিশেষ করে তার ভূগর্ভ আস্তানায় কারো

সাধ্য ছিলো না প্রবেশ করে। কিন্তু ভূগর্ভ ভেদ করে যেন আর্বিভাব ঘটেছিলো জমকালো মূর্তির।

অন্ধকারে দস্যুরাণী দু'খানা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ অনুভব করলো— শুধু স্পর্শ নয়, দু'খানা বলিষ্ঠ হাত তাকে তুলে নিলো কাঁধে।

দস্যুরাণীও কম শক্তিশালিনী ছিলো না তবু সে দুটি বলিষ্ঠ হাতের কাছে পরাজয় বরণ করলো, একটুও নড়তে পারলো না সে।

একখানা রুমাল দিয়ে মুখটা তার বাঁধা হয়ে গেছে। হাত-পা ছুড়েও কোনো কিছু করতে পারলো না দস্যুরাণী। অন্ধকারে সে অনুভব করলো দুটি বলিষ্ঠ হাত তাকে তার দরবারকক্ষের বাইরে নিয়ে এলো। যদিও চোখ দু'টো মুক্ত ছিলো তবু কিছু নজরে পড়ছে না। জমাট অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। আরও অনুভব করলো দস্যুরাণী তাকে সুড়ঙ্গপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

কে এই লোক যে দস্যুরাণীকে এমনভাবে কাবু করতে পারে? দস্যুরাণী নিজেও যেন ভেবে পাচ্ছে না। চিৎকার করবে তারও কোনো উপায় নেই, মুখখানা তার শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। অহেতুক হাত পা ছুঁড়ে কোনো ফল হবে না তবু সে কোনোক্রমে একখানা হাত-কোমরের বেল্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। যদি সে একটি হাত সে কোমরের বেল্টে নিয়ে যেতে সক্ষম হতো তাহলে দেখে নিতো কে এই বীর পুরুষ।

দস্যুরাণীকে কাঁধে নিয়ে সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। জমকালো মূর্তিটি।

ক্রমান্বয়ে দরবারকক্ষের কোলাহল মিশে আসছে দস্যুরাণীর কানে। শুধু ভারী বুটের শব্দ ছাড়া আর সে কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না।

দস্যুরাণী বুঝতে পারছে, যে সুড়ঙ্গপথে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা তারই ভূগর্ভস্থ আস্তানার সুড়ঙ্গপথ।

দস্যুরাণী হাত দিয়ে জমকালো মূর্তির পিছন অংশের জামা টেনে ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো এবং নিজকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে!

কিন্তু এতটুকু শিথিল করতে পারলো না সে বলিষ্ঠ দুটি হাতকে।

ক্রমান্বয়ে দস্যুরাণীর দেহটা যেন শিথিল হয়ে আসছে। অবিরত সে হাত পা ছুড়ছে বলিষ্ঠ হাতের বন্ধনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা চালিয়েছে।

সুড়ঙ্গপথে কেউ বাধা দিতে এলো না জমকালো মূর্তিটাকে। দস্যুরাণী আশা করেছিলো তার অনুচরগণ তাকে মুক্ত করে নেবে কিন্তু সুড়ঙ্গপথে কোনো রকম বাধাই এলো না।

এক সময় সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এলো জমকালো মূর্তি। চারদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাসের হিমেল পরশে দস্যুরাণী বুঝতে পারলো ভূগর্ভ আস্তানার গোপন সুড়ঙ্গপথ শেষ হয়ে গেছে।

এবার দস্যুরাণীর কানে ভেসে এলো একটি শিষ দেবার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো অশ্বপদশব্দ। নিকটে কোথাও কোনো অশ্ব যেন প্রতীক্ষা করছিলো, শিষ দেবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এলো বলেই মনে হলো তার।

জমকালো মূর্তি এবার তাকে সহ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো। মুহূর্তে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো অশ্বটি।

জমকালো মূর্তি দস্যুরাণীকে বাম হস্তে এঁটে ধরে ডান হস্তে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো।

ঠিক ঐ সময় শোনা গেলো একসঙ্গে প্রায় অসংখ্য অশ্বপদশব্দ।

দস্যুরাণী বুঝতে পারলো তার অনুচরগণ অশ্ব নিয়ে শত্রুর পিছু ধাওয়া করেছে, এবার নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করতে ওরা সক্ষম হবে।

জমকালো মূর্তিও দস্যুরাণীসহ অশ্বটি তখন বেগে ছুটে চলেছে।

পিছনে অগণিত অশ্বপদ শব্দ জেগে উঠছে।

জমাট নিকষ অন্ধকারে পাথুরিয়া মাটিতে এক অদ্ভুত প্রতিধ্বনি।

সম্মুখের অশ্বটি অন্ধকারে মিশে গেছে যেন।

আকাশে তারার মালা পিট পিট করে জ্বলছে কিন্তু সে আলোতে বিশ্বের জমাট অন্ধকার যেন আরও গাঢ় মনে হচ্ছে।

মন্থনা দ্বীপের পূর্বাঞ্চল ধরে শুধু পাথুরিয়া মাটি। শক্ত কঠিন মাটি ভেদ করে স্থানে স্থানে পেঙ্গুইন নামক এক ধরনের বৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃক্ষগুলো ঠিক শালগাছের মত দেখতে এবং তেমনি বৃহৎ আকার। কত যুগ যুগ ধরে যে এই পেঙ্গুইন বৃক্ষ মন্থনার পূর্বাঞ্চলে সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে কেউ তা বলতে পারবে না। মন্থনার প্রবীণ ভীল সর্দার আলমাও বলতে পারবে না এ গাছগুলোর জন্ম কবে কেমন করে হয়েছে।

ভীল সর্দার আলমার বয়স একশোর উপর। শক্ত-কঠিন মজবুত দেহ, যেন পাথর খুদে খুদে তৈরি করা একটি প্রস্তরমূর্তি।

পেঙ্গুইন বনের মধ্যে ছোট ছোট পাথুরিয়া টিলা! কতকগুলো বেশ বড়ও আছে, প্রায় ছোটখাট পাহাড়ের মত দূর থেকে দেখা যায়।

ভীল সর্দার আলমার বাস ছিলো একসময় সাগরের মধ্যে সিবিয়া দ্বীপে। দ্বীপ নয় যেন একটি অর্ধ জলমগ্ন কচ্ছপ। ছোট্ট দ্বীপ সিবিয়ায় গুটিকয়েক বাসিন্দা নিয়ে কোনরকমে বাসবাস করতো সে। কিন্তু ঈশ্বরের যেন আলমার এটুকু সুখ-সাচ্ছন্দ্য সহ্য হলো না। একদিন ঠিক কচ্ছপের মতই ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলো সিবিয়া।

আলমা তখন তার দলবল নিয়ে কোনোরকমে আশ্রয় নিয়েছিলো মাছধরা ডিংগিনৌকাগুলোর উপর। এ নৌকাগুলোই ছিলো সিবিয়া দ্বীপবাসীদের একমাত্র সম্বল।

এরা দিশেহারা হয়ে এসে উঠেছিলো মন্থনা দ্বীপে। আশ্রয় নিয়েছিলো। পেঙ্গুইন গাছের তলায়। সেখানে ওরা গড়ে তুলেছিলো ছোট্ট ছোট্ট গুহা পাথুরে টিলার মধ্যে।

মন্থনা দ্বীপের পুর্বাঞ্চলে বড় বেশি লোকজনের যাতায়াত ছিলো না। লোকালয় বলতে কিছু ছিলো না সেখানে। এ অঞ্চলে আলমা তাই অতি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস শুরু করে দিয়েছিলো।

গভীর রাতে অসংখ্য অশ্বপদশব্দ তাকে সজাগ করে তোলে। নিদ্রা ভেংগে যেতেই আলমা বেরিয়ে আসে গুহার বাইরে।

সর্দারকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে তার সহচরগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে, কারণ এ অঞ্চলে প্রায়ই হিংস্র জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটতো এবং আলমার দলবলকে নৃশংসভাবে হত্যা করতো।

আজও তারা মনে করে এমনি কিছু একটা ঘটেছে। তাই সবাই বেরিয়ে আসে সর্দারের সঙ্গে।

আলমা বৃদ্ধ।

দেহটা সম্পূর্ণ বেঁকে না গেলেও শালবৃক্ষের বাঁকা খুঁটির মত কিছুটা নুয়ে পড়েছে। মাথায় সাদা চুল, একমুখ দাড়িগোঁফ তাও সাদা, তবে একেবারে ধবধবে নয়, কিছুটা কটা লালচে বলা চলে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হলেও

তীক্ষ্ণ সতেজ প্রখর। সর্দার আলমা গুহার বাইরে এসে চারদিকে তাকালো। শুধু জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু নজরে পড়লো না। দূর থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছে।

সর্দার আলমা মাটিতে কান লাগিয়ে উবু হয়ে শোনে, তারপর বলে—ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি...

সঙ্গীরা উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বলে উঠে—এই গভীর রাতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ...

হাঁ, তবে একটা শব্দ খুব কাছে মনে হচ্ছে এবং অন্যগুলো বেশ দূরে...

এখন কি করা যায় বলো সর্দার? বললো আলমার সঙ্গী-সাথীরা।

আলমা নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলো—তোরা সব যার যে গুহায় চলে যা...

বললো সবাই —আর তুমি...

আলমা বললো—আমি এখানে এই পথের ধারেই থাকবো...

বললো সবাই—তা হয় না...

হাসলো আলমা—কেন হবে না? তোরা সবাই নিশ্চিন্ত মনে চলে যা। আমি একা থাকবো। মরতে হয় একা মরবো, তোরা চলে যা...

আলমার কথায় তার সঙ্গী-সাথীরা না গিয়ে আত্মগোপন করে রইলো।

শুধু আলমা দাঁড়িয়ে রইলো পেঙ্গুইন গাছের তলায়, পাথুরে মাটির বুকে সরু পথটার ধারে। যদিও অন্ধকারে কিছু নজরে পড়ছিলো না তবু বুড়ো আলমা তাকিয়ে রইলো সম্মুখের দিকে।

হঠাৎ কানে এলো আলমার কে যেন তাকে বললো—সর্দার, গুহার ভিতরে যা, নইলে অসংখ্য ঘোড়ার খুরের তলায় পিষে থেতলে যাবে তোর দেহটা।

বুড়ো চমকে না উঠলেও আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলেছে—কে, মাঠাগা?

হাঁ চাচা।

তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্?

তোমাকে একা ফেলে যেতে পারি না।

অন্ধকারে আলমার মুখ দেখা না গেলেও শুধু শোনা যায় তার কণ্ঠ—আমাকে একা ফেলে যাবি না তবে মরবি?

বললো মাঠাগা—তুমি যদি মরো তবে আমিও মরবো। যাবো না...

সত্যি যাবি না?

তোমাকে একা রেখে কোন্ প্রাণে যাবো?

তবে দাঁড়িয়ে থাক দেখবি কেমন করে একরাশ ঘোড়া আমার কুঁকড়ে যাওয়া দেহটাকে পিষে ফেলে।

সর্দার তুমি মরবে?

যদি মরণ আসে তবে মরবো। ওরে মাঠাগা, তুই বড্ড বোকা। আমি বুড়ো হয়েছি না হয় মরলাম। কিন্তু তুই...যা শিগগির পালা। যা বলছি, চট করে যা লক্ষ্মী মাঠাগা...

এবার না গিয়ে পারে না মাঠাগা, কারণ আলমার কথাগুলো বড় কোমল নরম ছিলো।

মাঠাগা চলে যায়।

কুকড়ে যাওয়া দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আলমা। ততক্ষণে সম্মুখস্থ অশ্বপদশব্দ অতি নিকটে এগিয়ে এসেছে।

আরও কিছুক্ষণ কেটে যায়।

জমকালো অশ্বারোহী এগিয়ে আসে।

অন্ধকারে আলমা একটি শব্দ করে।

সঙ্গে সঙ্গে জমকালো মূর্তি তার অশ্বের লাগাম টেনে ধরে।

অশ্ব থেমে যায়।

আলমা অন্ধকারে ইংগিত করে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

জমকালো মূর্তি দস্যুরাণীকে শক্ত করে ধরে মাথাটা একটু নত করে অভিবাদন জানায় সে আলমাকে। তখন ভোরের ক্ষীণ আভায় পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

আলমা যেদিকে ইংগিত করে দেখিয়ে দিলো সেইদিকে অশ্ব চালনা করলো এবার জমকালো মূর্তি।

তীরবেগে ছুটলো সে।

পিছনে তখন অসংখ্য অশ্বপদ শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। মাত্র কয়েক দন্ড, তার মধ্যেই এসে পড়লো এক ঝাঁক অশ্ব, তীরবেগে আল্‌মার সম্মুখ দিয়ে চলো গেলো।

আলমা হাসলো একটু।

সম্মুখস্থ অশ্বটি তখন বহুদূরে চলে গেছে। পিছনের অশ্বঝাঁক অনুসরণ করে তীরবেগে এগুচ্ছে। পূর্বাকাশ বেশ পরিস্কার হয়ে এসেছে, সবকিছু ভালভাবে নজরে পড়ছে।

জমকালো মূর্তি দূরে এগিয়ে যেতেই তার দৃষ্টিগোচর হলো সম্মুখে বিরাট একটি খাদ। প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত প্রশস্ত ফাটলের তলদেশে কঠিন পাথুরিয়া মাটি। জমকালো মূর্তি মুহূর্তের জন্য একবার অশ্ব বল্‌গা টেনে ধরলো, অশ্বসহ পিছিয়ে এলো কিছুটা। কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ বেগে এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো ফাটলের ওপাশে।

ততক্ষণে পিছনের অশ্বঝাঁকও ঐ ফাটলের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এতবড় খাদ জমকালো মূর্তি অতি সহজে পার হয়ে গেলো দেখে অশ্বারোহীরা বিস্মিত হতবাক হয়ে গেলো। তারা নিজ নিজ অশ্বসহ ফাটলের ধারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ওদিকে দস্যুরাণীসহ জমকালো মূর্তি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো দস্যুরাণীর অনুচরগণ। তারা সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলো। সবার অগ্রভাবে রয়েছে রহমত।

রহমতের দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। এমনভাবে কোনোদিন পরাজয় বরণ করেনি তারা। রাণীকে এভাবে হরণ করবে, কেউ ভাবতেও পারেনি। অধর দংশন করতে লাগলো রহমত।

একজন বললো—এখন উপায় রহমত?

রহমত বললো—সম্পূর্ণ উপায়হীন হয়ে পড়েছি আমরা। কে এই জমকালো মূর্তি যে রাণীকে চুরি করে নিয়ে উধাও হলো।

কিন্তু এত ভাববার সময় কই, যেমন করে হোক রাণীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।

সবাই ফিরে চললো।

আলমা তখনও দাঁড়িয়েছিলো।

অশ্বঝাঁক ফিরে যাচ্ছে দেখে হাসলো আলমা। রহমত তার দল নিয়ে দ্রুত ফিরে চলেছিলো তাই তারা আলমার হাসি দেখতে পেলো না। যদি ঐ মুহূর্তে তারা আলমাকে হাসতে দেখতো তবে কোনোক্রমে রেহাই পেতো না সে। রহমত তাকে হত্যা করতো নৃশংসভাবে।

রহমত দলবলসহ ফিরে এলো আস্তানায়।

সেই দরবারকক্ষ।

কিছুক্ষণ পূর্বে যেখানে চলেছিলো নাচ-গান হাসি-আনন্দ আর, এই মুহূর্তে সেখানে নেমে এসেছে বিষাদের ঘনছায়া। সবার মুখেই নিরানন্দের ছাপ বিদ্যমান। যে যার আসনের সম্মুখে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।

রহমত কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বললো—রাণীকে উদ্ধার করতে হলে আমার অনেককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। বলো কে কে তোমরা যাবে আমার সঙ্গে?

সবাই বললো—আমরা রাণীজীর উদ্ধারের জন্য সবাই হাসিমুখে প্রাণ দিতে রাজি আছি।

বেশ, তাহলে প্রস্তুত হয়ে নাও।

আমরা প্রস্তুত আছি। একসঙ্গে বললো সকলে।

রহমত বললো—আমি খুশি হলাম। হাঁ, আমরা ঐ খাদ পেরিয়ে ওপারে যাবো এবং রাণীজীকে উদ্ধার করে আনবো। কোনো শক্তিই আমাদের পথরোধ করতে পারবে না।

ঐ সময় একজন বৃদ্ধ অনুচর এগিয়ে এলো, নাম তার হিগাকো ঈশা। বহুকাল থেকে সে দস্যুতা করে এসেছে। যদিও তার পেশা ছিলো পরের সম্পদ লুটে নেওয়া কিন্তু মন ছিলো বড় উদার। তারই কোনো এক সঙ্গীর মুখে দস্যুরাণীর নাম শুনে মুগ্ধ হয়েছিলো সে। অনেক কষ্টে একদিন দেখা করবার সুযোগ পেয়েছিলো হিগাকো ঈশা দস্যুরাণীর সঙ্গে। মনের বাসনা সে জানিয়েছিলো অকপটে—আমি তোমার দলে আসতে চাই। রাণী প্রথমে রাগ করেছিলো কিন্তু পরে তাকে নিজের দলে গ্রহণ করেছিলো এবং সেই থেকেই হিগাকো রয়ে গেছে দস্যুরাণীর একজন অনুচর হিসেবে।

হিগাকো মন্থনা দ্বীপের আস্তানার একজন অনুচর। তার কাজ ছিলো, সবাই যখন দস্যুতা করে ফিরে আসে তখন তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে রাখা এবং পুনরায় যখন দস্যুতার গমন করে তখন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যুগিয়ে দেওয়া।

দরবারকক্ষে যখন আনন্দোৎসব চলছিলো তখন হিগাকো তার সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ হিসেব করে গুছিয়ে রাখছিলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা বিপদসঙ্কেত ধ্বনি ভেসে আসে তার কানে। বুঝতে পারে হিগাকো, নিশ্চয়ই আস্তানায় কোনো অঘটন ঘটেছে। বৃদ্ধ হাতের কাজ ফেলে ছুটে যায় দরবারকক্ষের দিকে।

দরবারকক্ষের নিকটে পৌঁছতেই চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে পায় আর শুনতে পায়ে শুধু ধস্তাধস্তির শব্দ।

হিগাকো শিউরে না উঠলেও বুঝতে পেরেছিলো এমন কোনো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার কিছু ঘটেছে, নিকষ অন্ধকারে সে দেখতে পাচ্ছে না।

চারদিকে শুধু অন্ধকার।

দিশেহারার মত ঘুরতে থাকে হিগাকো।

ঠিক ঐ সময় তার সম্মুখ দিয়ে কে যেন চলে গেলো দ্রুতবেগে। হিগাকো সেই মুহূর্তে কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পেরেছিলো কেউ এসেছিলো দরবারকক্ষে, যে কাজ শেষ করে চলে গেলো।

হিগাকো বাধা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। কারণ অন্ধকারে সে এক পাও এগুতে পারে নি। বিরাট একটা ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিলো সে নিজকে। কিছু পরে দরবারকক্ষে আলো জ্বললে দেখা গেলো রাণী নেই।

মাথায় তখন বাজ পড়েছিলো সবার।

রহমত মুহূর্ত বিলম্ব না করে অনুচরদের আদেশ দিয়েছিলো তাকে অনুসরণ করতে। ঐ দন্ডে একশ ঘোড়াও তৈরি ছিলো, অনুচর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো ভূগর্ভ আস্তানার সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে।

জমকালো মূর্তি যে পথে দস্যুরাণী সহ বেরিয়ে গিয়েছিলো, অশ্ব নিয়ে সে পথে চলা দুষ্কর ছিলো, তাই রহমত দলবল নিয়ে যে বিরাট সুড়ঙ্গপথটি

বেরিয়ে এসেছিলো ভূগর্ভ থেকে পৃথিবীর বুকে, ঐ পথ ধরেই এসেছিলো সে দলবল নিয়ে এবং অতি দ্রুতবেগে ধাওয়া করেছিলো জমকালো মূর্তির।

কিন্তু বিফল হয়েছে তারা।

রহমত ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লেও সে এক দন্ডের জন্য হতাশ হয়নি। নিজেকে কঠিন রেখে সে রাণীর উদ্ধারের জন্য আগ্রাহ প্রকাশ করে চলেছে। রহমতের কথায় সরে এলো হিগাকো, বললো—ছোট সর্দার, একটা কথা বলবো?

হিগাকো রহমতকে ছোট সর্দার বলে ডাকতো। কারণ, রাণীজীর অবর্তমানে রহমতই আস্তানা পরিচালনা করতো। শুধু মন্থনা দ্বীপ আস্তানাই নয়, দস্যুরাণীর বিভিন্ন আস্তানার সহকারি অধিনায়ক ছিলো সে। তাই সবাই রহমতকে সমীহ করতো।

হিগাকোর কথায় বললো রহমত—বলো কি কথা।

হিগাকো বললো—রাণীজীকে কেউ কোনোদিন আটকে রাখতে পারবে না ছোট সর্দার, কাজেই তোমরা অহেতুক প্রাণ বিনষ্ট করো না।

চোখ দুটো জ্বলে উঠে রহমতের, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—নরাধম, বুঝতে পেরেছি রাণীর অমঙ্গলই তোমার কামনা। এই দন্ডে একে একে বন্দী করে রাখো, রাণীজীকে মুক্ত করে এনে এর বিচার হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হিগাকোকে বন্দী করে ফেললো তারা। তাকে অন্ধকারাগারে আটক করে রাখা হলো।

রহমত আদেশ দিলো—তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হয়ে নাও, আর এক মুহূর্ত আমাদের বিলম্ব করা উচিত নয়। এ পৃথিবী আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজবো কোথায় সেই জমকালো মূর্তি আমাদের রাণীকে নিয়ে রেখেছে......

রহমতের কথায় সবাই সমস্বরে সম্মতি দান করলো এবং যে যার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলো।

হিগাকোকে অন্ধ কারাকক্ষ থেকে চিৎকার করে বললো—তোমরা ভুল পথে যেওনা। রাণীজীকে তোরা কোথাও খুঁজে পাবে না। যেও না...যেও না...যেও না......

কিন্তু হিগাকোর কথা কেউ কানে নিলো না। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

❑

আমলা চিৎকার করে ডাকলো—মাঠাগা, মাঠাগা এসো দেখবে, এসো এধার।

আলমার চিৎকারে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো মাঠাগা, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন এসে দাঁড়ালো আলমার চারপাশ ঘিরে।

সবার চোখেমুখেই উত্তেজনার ছাপ।

বললো আলমা—তোরা শুনতে পাচ্ছিস্ কিছু?

বললো মাঠাগা—হাঁ, আবার সেই অশ্বপদশব্দ শুনতে পাচ্ছি।

এবার তোরা খাদটার পাশে গিয়ে লুকিয়ে পড়, দেখবি পতঙ্গ যেভাবে আগুনে লাফিয়ে পড়ে তেমনি নির্বোধ অশ্বারোহীরা ওই খাদের মৃত্যুগহ্বরে কেমন করে আত্মাহুতি দেয়।

আলমার কথায় তার দলবল সবাই সরে গেলো, একরকম প্রায় ছুটেই গিয়ে লুকিয়ে পড়লো সেই মৃত্যুগহ্বর খাদটার আশেপাশে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে।

ততক্ষণে নিকটবর্তী হয়েছে অশ্বারোহীরা।

একসঙ্গে প্রায় একশ অশ্বারোহী তীরবেগে চলে গেলো আলমার সম্মুখ দিয়ে।

আলমা হাসলো, মনে মনে বললো—ওরা নির্বোধ।

খাদের পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো অশ্বারোহীরা। সবার মুখই কালো হয়ে উঠেছে। সম্মুখে মৃত্যুগহ্বর। ওপাশে তাদের প্রিয় রাণীজী শত্রুহস্তে বন্দিনী।

রহমত চিৎকার করে বলে—থামলে কেন? যাও খাদ পার হয়ে যাও...

রহমতের নির্দেশ পাওয়ামাত্র শ্যাম নামক এক বলিষ্ঠ অনুচর তার অশ্ব নিয়ে প্রচণ্ডবেগে লাফ দিলো খাদের ওপাশ লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক আর্তনাদ ভেসে এলো। সে এক বীভৎস দৃশ্য! শ্যাম এবং তার অশ্ব খাদের তলদেশে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো অশ্ব সহ শ্যামের দেহটা।

রহমত একটুও ঘাবড়ালো না, পুনরায় সে নির্দেশ দিলো অপর জনকে খাদ পার হবার জন্য।

একটু বিলম্ব করলো না, রহমানের নির্দেশ পাবার পর পরই অশ্ব বিনয়ে বীরবিক্রমে লাফ দিলো দস্যুরাণীর বিশ্বস্ত অনুচর ইউছুফ।

ঠিক শ্যামের মতই সেও অশ্বসহ খাদের গভীর গহ্বরে কঠিন পাথরে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো।

শিউরে উঠলো অশ্বারোহীরা।

রহমতের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। সে পুনরায় অপর একজনকে আদেশ করলো।

তৎক্ষণাৎ অপরজন অশ্ব নিয়ে এগিয়ে এলো এবং প্রচন্ড শক্তি নিয়ে লাফ দিলো খাদের অপর পার লক্ষ্য করে। কিন্তু সেও পারলো না, খাদের কঠিন পাথরে আছাড় খেয়ে পড়লো।

প্রায় বিশজন প্রাণ হারালো কিন্তু কেউ খাদের ওপারে পৌছাতে সক্ষম হলো না।

এবার রহমতের মন হতাশা এব ব্যর্থতায় ভরে উঠলো। এখন উপায় কি করা যায়, কি করে ওপারে যাবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো।

আলমার অট্টহাসি ভেসে এলো রহমতের কানে। তার দলবল আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলো।

আলমার অট্টহাসির শব্দ রহমতের কানে যেতেই রহমত অশ্বমুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সঙ্গীদের লক্ষ করে বললো—দেখো কে এখানে আমাদের আশেপাশে আত্মগোপন করে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

রহমতের কথায় ছুটে যায় তার সঙ্গীসাথীরা। অন্বেষণ চালিয়ে বুড়ো আলমাকে ধরে আনে।

রহমতের চিনতে বাকি থাকে না এই বুড়োই তখন দাঁড়িয়েছিলো পথের পাশে। এতবড় স্পর্ধা ওর, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বিদ্রুপপূর্ণ হাসি হাসছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে রহমত এবং ঐ মুহূর্তে অস্ত্র বের করে বসিয়ে দেয় আলমার বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে আলমার সঙ্গীরা বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে। তাদের হাতেও মারাত্মক অস্ত্র ছিলো, সবাই ভীষণভাবে আক্রমণ করতে যায় রহমতের দলকে।

আলমা হাত তুলে তাদের ক্ষান্ত হতে বলে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে আলমার বুক, তবু সে দক্ষিণ হস্তে বুকের ক্ষত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে টলতে থাকে।

আলমার অদ্ভুত ব্যবহার দেখে বিস্মিত হয় রহমত। সে তাকে হত্যা করলো অথচ তার দলবলকে প্রতিশোধ নিতে দিচ্ছে না লোকটা— আশ্চর্য বটে, দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে রহমত বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধ আলমা ঢলে পড়ে ভূতলে, অতিকষ্টে বলে সে—তোমরা অহেতুক প্রাণ বিনষ্ট করছো...যার উদ্ধারের...আশায় তোমরা...চেষ্টা চালাচ্ছো...তাকে...তোমরা উদ্ধার...করতে পারবে না...সে যখন... ফিরে আসবে...তখন সে আপনা আপনি...আসবে...

আলমার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ঢলে পড়ে ওর মাথাটা একপাশে!

রহমত অশ্বত্যাগ করে বৃদ্ধের মাথাটা তুলে নেয় কোলে। অনুশোচনায় ভরে উঠে তার হৃদয়। বৃদ্ধের কথাগুলো তার মনকে ব্যথাকাতর করে তোলে। মনে পড়ে তাদের অনুচর হিগাকোর কথাগুলো, "রাণীজীকে কেউ কোনোদিন আটকে রাখতে পারে না ছোট সর্দার। কাজেই তোমরা অহেতুক প্রাণ বিনষ্ট করো না"...বারবার ঐ কথগুলো প্রতিধ্বনি হতে লাগলো রহমতের কানে। তারই নির্দেশে তাকে অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

রহমত আর বিলম্ব না করে দলবল সহ ফিরে চললো। বৃদ্ধ আলমার মৃতদেহ পড়ে রইলো পিছনে। তার মৃতদেহের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো তার দলবল। সবার চোখেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে কিন্তু সর্দারের নিষেধ আছে, আলমা বারণ করেছে ওদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে তাই তারা নীরবে হজম করে গেলো শত্রুর নির্মম আচরণ।

রহমত আস্তানায় ফিরে এসে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো এখন কিভাবে রাণীজীর উদ্ধারে তারা অগ্রসর হবে। হঠাৎ মনে পড়লো মিঃ আহাদ

চৌধুরীর কথা, এই বিপদ মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মনস্থির করে নিলো রহমত। মিঃ আহাদ চৌধুরী এখন ঝাঁম শহরে আছেন জানতে পেরেছিলো সে কোনোক্রমে। কাজেই কতকটা আশ্বস্ত হলো রহমত এবং ঝাম শহর অভিমুখে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হলো।

ফিরে এসেই মুক্তি দিয়েছিলো রহমত হিগাকো ঈশাকে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলো সে। দস্যুরাণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা তাদের ব্যর্থ হবে, এ কথাই বলেছিলো বৃদ্ধ হিগাকো, সত্যই হলো তাই।

তাই মৃত্যুগহ্বরে প্রাণ দিতে হলো তারই কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে।

রহমত ঝাম শহর অভিমুখে রওয়ানা দেবার পূর্বে হিগাকো ঈশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো—বলো এবার আমার যাত্রা শুভ না অশুভ হবে?

হিগাকো ঈশা হেসে বললো—যাত্রা শুভ বলেই মনে হচ্ছে রহমত কিন্তু কিছু বিপর্যয়ের আভাসও আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিপর্যয়!

হাঁ, রাণীজীকে উদ্ধার করতে গিয়ে কিছু বিপর্যয় আসবে কিন্তু সে বিপর্যয়কে পরিহার করে এগুতে হবে। তবে রাণীজীকে কেউ আটকে রাখতে সক্ষম হবে না। ফিরে সে আসবেই......

এ কথা তুমি আরও বলেছো হিগাকো। যতদিন না রাণীজী ফিরে এসেছে ততদিন আমাদের স্বস্তি নেই।

রহমত ঐ দিনই রওনা দিলো ঝাম অভিমুখে। মন্থনা দ্বীপ থেকে ঝাম শহর হাজার হাজার মাইল দূরে। ঝাম শহরে যেতে হলে নীল নদ অতিক্রম করে যেতে হয়। প্রথমে অশ্বপৃষ্ঠে পরে জাহাজে এবং তার পরে উটের পিঠে, তারপর পদব্রজে।

রহমতের অশ্ব বেগে ছুটতে শুরু করলো।

আকাশে তখন খণ্ডখণ্ড মেঘের আনাগোনা চলেছে। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বিলম্ব নেই।

❑

মিঃ আহাদ চৌধুরী ঝাম শহরের সবচেয়ে বড় বাংলো শিংশোশায় একটি বড় কক্ষে সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট পান করে চলেছে। কক্ষের চারপাশে বিরাট আকারের চারটি জানালা।

মিঃ আহাদ সম্মুখস্থ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের কুয়াশাচ্ছন্ন ঝাম শহরের দিকে। সকাল থেকে বড় কুয়াশা পড়ছে আজ। বাইরে বের হবার ইচ্ছা থাকলেও কেউ সহজে ঘরের বাইরে যাচ্ছে না। অতি প্রয়োজন বলেই কিছু কিছু লোক পথে নেমেছে। দু'চারটা উটের গাড়ি চলে যাচ্ছে পথ বেয়ে। ঝাম শহরে বড় একটা কুয়াশা নামে না সহজে, তবে এবার যেন কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। ক'দিন হলো সময়ে অসময়ে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা ঝাম শহরটা।

ঘন কুয়াশার স্তর ভেদ করে নজরে পড়ছিলো ঝাম শহরের পিছনে ইরিকা পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গমালা। মেঘের স্তরের মতই লাগছিলো, স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো না কিছু।

মিঃ আহাদ আপন মনে সিগারেট থেকে ধুম্ররাশি নির্গত করে চলেছেন। তার চারপাশ ঘিরে ধুম্রকুণ্ডলি ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিলো।

মিঃ আহাদ ভাবছিলো তার কাজের কথা। ঝাম শহরে তিনি এসেছেন কোনো এক রহস্যজাল উদঘাটন উদ্দেশ্যে। প্রথমে তিনি সিন্ধিরাজ্যে গিয়েছিলেন এবং সিন্ধিরাজ্যে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করার পর এসেছেন ঝাম শহরে।

আজ ঝাম শহরে মিঃ আহাদের চতুর্থ দিন। এসেই তিনি কাজে নেমে পড়েছেন। এ তাঁর অভ্যাস, নিরিবিলি সময় কাটানো মোটেই ভালো লাগে না। অদ্ভুত অভ্যাস বলা যায়—কেউ বলে কাজের লোক, কেউ বলে প্রখ্যাত গোয়েন্দারা চুপচাপ থাকতে পারে না।

কথাটা মিথ্যা নয়, কাজ না থাকলে মিঃ আহাদ চৌধুরী যেন স্বস্তিই পান না এক মুহূর্তের জন্যও। হাঁপিয়ে পড়েন একেবারে। সঙ্গী সাথী কেউ থাকলে তাস কিংবা পাশা নিয়ে বসেন। এসবে ঝোঁক তেমন না থাকলেও মনকে মানিয়ে নেন। অবশ্য যে কোনো খেলায় তাঁর পাকা হাত আছে এ কথা সত্য।

ছোটবেলা থেকে শরীরচর্চা, খেলাধুলো তাঁর অভ্যাস। ফুটবল খেলা থেকে হা-ডু-ডু খেলাও তিনি জানেন এবং কাঁচা নন পাকা বলা যায়। তবে এখন পাকা গোয়েন্দা বনে যাওয়ায় ওসবের কথা ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা। বড় ভাল লাগে ওসব কথা ভাবতে। ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় তাঁর ঐ দিন গুলোতে...

আজও কুয়াশাঝরা সকাল বেলায় একা একা ঘরে বসে বড্ড নিঃসঙ্গ লাগছিলো—যদিও সিগারেট ছিলো তার পরম বন্ধুর মত একজন সাথী, তবু বড় একা মনে হচ্ছিলো আজ। রাশিকৃত ধুম্রজালে আচ্ছাদিত হয়ে ভাবছিলেন কুয়াশাগুলো বড় বেয়াড়া, নইলে এতক্ষণ তিনি বেরিয়ে পড়তেন...

এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। মিঃ আহাদের মুখখানা যেন দীপ্ত হয়ে উঠে—ভাবেন তিনি যাক তবু কেউ এলো কিছুটা সময় উৎরে নেওয়া যাবে। হয়তো ততক্ষণে বাইরের ঘন কুয়াশা কিছুটা হালকা হয়ে আসবে। আংগুলের সিগারেটটা সম্মুখস্থটি রক্ষিত ছোট্ট এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে ওভারকোটটা পরে নিলেন গায়ে, কারণ বেশ শীত শীত লাগছিলো। যেই আসুক না কেন কিছু সময় কাটানো যাবে।

দরজা খুলে দিতেই এক হপ্‌কা কুয়াশার সঙ্গে একটি লোক ঘরে প্রবেশ করলো। মিঃ আহাদ লোকটাকে চিনেত না পারলেও ওকে ভেতরে আহ্বান জানিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন। দরজা বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন তিনি আগন্তুকের মুখের দিকে।

লোকটা বুঝতে পারলো তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন আহাদ চৌধুরী। আর বিস্মিত হবার কথাও বটে, কারণ লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মিঃ আহাদ কিছু বলবার পূর্বেই বলল আগন্তুক—আমি মন্থনা থেকে আসছি।

মিঃ আহাদ তখনও নীরব রয়েছেন, হয়তো পরবর্তী কথাটা শোনার জন্য উদগ্রীব আছেন তিনি।

আগন্তুক একটু থেমে বললো—আপনি কি মিঃ আহাদ চৌধুরী?

এবার মিঃ আহাদ বললেন—হাঁ! কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারছি না?

আমি রহমত, মন্থনা দ্বীপের আস্তানা থেকে আসছি। বলে থামলো রহমত, ওর গা থেকে বিন্দু বিন্দু কুয়াশা জমা জল ঝরে পড়ছে। বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে।

ওর কথায় মিঃ আহাদের ভ্রুজোড়া ঈষৎ স্ফীত হলো। তিনি বললেন—মন্থনা দ্বীপ! রাণীর কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছো?

হাঁ, চলুন বসে বলছি।

এসো।

এগুলেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

ফিরে এলেন ওরা পূর্বের সেই জায়গায়।

মিঃ আহাদের মুখমণ্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, একটা বিপুল উন্মাদনা নিয়ে তাকান তিনি রহমতের মুখের দিকে। কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা দুর্ভাবনার ছাপও ফুটে উঠেছে, না জানি কি সংবাদ সে এনেছে মন্থনা থেকে। মিঃ আহাদ জানতেন রাণী এখন মন্থনায় আছে। কেমন আছে, কি করছে তিনি জানতেন না। তাই তাঁর মনে বিরাট একটা জানার বাসনা।

বললেন মিঃ আহাদ—বসো।

রহমত বেশ ক্লান্ত ছিলো তাই সে বসে পড়লো একটা সোফায়। কোনোরকম দ্বিধা না করেই বললো—মিঃ চৌধুরী, গত পরশু আমাদের আস্তানায় বিশেষ কোনো কারণবশতঃ আনন্দোৎসব চলছিলো। এমন সময় একটি জমকালো মূর্তির আবির্ভাব ঘটে সেখানে......

থামলো রহমত।

মিঃ আহাদ উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বললেন—তারপর?

জমকালো মূর্তি এমনভাবে আবির্ভূত হয়েছিলো যেন সে ভুইফোঁড় হয়ে বেরিয়েছে বলে মনে হলো। তার দু'হাতে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো। ঐ মুহূর্তে

আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না, কাজেই কোনো অস্ত্র হাতে তুলে নেবার সুযোগ পেলোনা কেউ।

রাণী—রাণী তখন কোথায় ছিলো?

সেই দরবারকক্ষেই ছিলো সে। রাণীজীও কোনোরকমে অস্ত্রে হাত দিতে পারলো না। জমকালো মূর্তি রাণীজীর বুক লক্ষ্য করেই তার হস্তস্থিত অস্ত্র উদ্যত করেছিলো, তাই কেউ কিছু করতে পারলাম না। হঠাৎ ঐ সময় আস্তানার সব আলো নিভে গেলো। আশ্চর্য, জমকালো মূর্তি যেন যাদু জানতো।

রহমত বলে চলেছে, মিঃ আহাদ চৌধুরী দু'চোখে রাশিকৃত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার মুখে। কাহিনীর শেষটা তিনি জানার জন্য যেন উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

রহমত বলে চলেছে—আলো নিভে যেতেই শুরু হলো ভীষণ ধ্বস্তাধস্তি। অন্ধকারে কেউ গুলি ছুড়তে বা কোনো রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে পারছি না আমরা, কারণ শত্রুপক্ষ একজন আর সবাই আমরা...

বলো তারপর কি হলো? রাণী, রাণীর সংবাদ কি বলো?

বড় দুঃসংবাদ!

দুঃসংবাদ?

হাঁ, রাণী নেই......

রাণী নেই?

না। সেই অন্ধকারে রাণীজীকে নিয়ে উধাও হয়েছে সেই জমকালো মূর্তি।

বলো কি রহমত! কথাটা বলে মিঃ আহাদ চৌধুরী ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে রহমতও উঠে দাঁড়ায়।

মিঃ আহাদ ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে—জমকালো মূর্তি তোমাদের রাণীজীকে হরণ করে নিয়ে গেলো আর তোমরা চুপচাপ রইলে? কিছু করতে পারলে না তোমরা?

মাথা নিচু করে জবাব দিলো রহমত—আলো জ্বলার পর আমরা দেখলাম রাণীজী নেই, শুধু পড়ে আছে তার রিভলভারখানা। রাণীজী

অন্ধকারেই নিজের কোমরের বেল্‌ট থেকে রিভলভারখানা খুলে নিয়ে ছিলো কিন্তু ব্যবহার করবার সুযোগ পায়নি।

মিঃ আহাদের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো, ক্রুদ্ধভাবে অধর দংশন করে বললেন—তোমরাও সুযোগ পাওনি, রাণীও পায়নি...কে সে জমকালো ব্যক্তি যার কাছে তোমরা এতগুলো বীর পুরুষ পরাজয় বরণ করলে?

জানিনা মিঃ চৌধুরী কে সে। নত মস্তকেই জবাব দিলো রহমত।

মিঃ আহাদের ভ্রুকুঞ্চিত হলো, তিনি বললেন—দস্যু বনহুর তো কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেনি?

না, তাকে রাণীজী পাতাল গহ্বরের অন্ধ কারাকক্ষে বন্দী করে রেখেছে, কারো সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে।

মিঃ আহাদ চৌধুরীর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন—তোমাদের রাণীজী চুরি হবার পর তোমরা কি পাতাল গহ্বরে গিয়ে সন্ধান নিয়েছিলে সে সেখানে আছে কিনা?

না, সন্ধান নেইনি। জানি তাকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখান থেকে সাধ্য নেই সে পালায়।

মিঃ আহাদ একটু শব্দ করলেন—হুঁ। এবার তিনি পায়চারী শুরু করলেন।

রহমত স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো মিঃ আহাদের দিকে। মিঃ আহাদের মুখমণ্ডল রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে। রাগেক্রোধে তিনি যেন ভিতরে ভিতরে গুমড়ে উঠছিলেন। না জানি কোন্ মুহূর্তে তিনি ফেটে পড়বেন কিন্তু মিঃ আহাদ ঠিক ফেটে পড়লেন না, শান্তকণ্ঠে বললেন—তোমরা ভুল করেছো, সেই জমকালো মূর্তি স্বয়ং দস্যু বনহুর......

অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে রহমত—অসম্ভব মিঃ চৌধুরী, এটা কোনো দিন হতে পারে না। দস্যুরাণীর পাতাল গহ্বর থেকে পালানো কারো সাধ্য নেই।

মিঃ আহাদ হেসে উঠলেন, হাসি থামিয়ে বললেন—অসাধ্য কিছুই নয় রহমত, এ কথা তুমি নিজেই বুঝতে পারছো। কারণ রাণীকে কেউ কোনোদিন বন্দী করে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি নিজেও জানো। তবে যদি কেউ তাকে বন্দী করে নিয়ে যায় তাকে আমি অস্বাভাবিক মানুষ বলবো। আমার বিশ্বাস, দস্যু বনহুর রাণীর পাতালপুরীর অন্ধ গহ্বরে বন্দী নেই এবং

সে-ই দস্যুরাণীকে নিয়ে উধাও হয়েছে। রহমতের মুখখানা অমাবস্যার অন্ধকারের মত অন্ধকার হয়ে গেলো। দৃষ্টি তার চলে গেলো সম্মুখের জানালা দিয়ে কুয়াশা ঢাকা ঝাম শহরের দিকে। ঠিকইতো, তারা কেউ পাতালপুরীর অন্ধগহ্বরে সন্ধান নিয়ে দেখেনি সেখানে দস্যু বনহুর বন্দী অবস্থায় আছে কিনা।

রহমতের মুখোভাব লক্ষ্য করে মিঃ আহাদ বুঝতে পারলেন তাঁর অনুমান সত্য। স্বয়ং দস্যু বনহুরই রাণীকে নিয়ে পালিয়েছে অথচ রাণীর অনুচরবর্গ তা এখনও জানে না। না জানি রাণীকে সে কিভাবে রেখেছে, তার সঙ্গে কি ব্যবহার করছে।

মিঃ আহাদের মুখোভাব গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠলো। তিনি আসন গ্রহণ করে অধর দংশন করলেন।

রহমত দাঁড়িয়েই বললো—মিঃ চৌধুরী, আপনি যা বললেন সত্যও হতে পারে। তবে অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, যেভাবে পাতালপুরীর অন্ধকারাগারে দস্যু বনহুরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো, সাধ্য নেই সে পালাতে পারে কিন্তু......

বলো, থামলে কেনো?

এখন ভেবে দেখছি অসম্ভব কিছু নয়।

হাঁ, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমারও একদিন নানারকম ধারণা ছিলো। তার সম্বন্ধে অনেক অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম। তাই ইচ্ছা করেই একবার তাকে গ্রেপ্তার করার বাসনা নিয়ে কান্দাই গিয়েছিলাম। থামলেন মিঃ আহাদ।

রহমত উদগ্রীবভাবে তাকিয়ে আছে মিঃ আহাদের মুখের দিকে। দস্যু বনহুরকে যদিও তারা বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে, তবু ওর সম্বন্ধে যেন অনেক জানার বাকি আছে তাদের।

বললেন মিঃ আহাদ চৌধুরী—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি, কারণ তাকে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে পারিনি।

রহমত যেন ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই পাশের সোফায় বসে পড়লো, তার দু'চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মিঃ আহাদের মুখে।

মিঃ আহাদের বলিষ্ঠ দীপ্ত সুন্দর মুখখানায় গভীর একটা ভাবের উন্মেষ ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন — দস্যু বনহুরের কাছে আমি পরাজিত হয়েছিলাম রহমত।

মিঃ চৌধুরী, আপনি বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ্ অথচ কিনা বলছেন......

হাঁ, যা সত্য তাই বলছি। আর সত্যই যদি না হবে তবে কেন তাকে পাশে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে পারিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিলো সে মহৎ উদার, দস্যু হলেও তার হৃদয় আছে। আজ বুঝতে পারছি সে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি জানতাম, দস্যু বনহুর নারীর প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করে না। আজ আমার সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলো! রহমত, আমিও কম নই......দস্যু বনহুর রাণীকে হরণ করে মোটেই ভাল করেনি......দাঁতে দাঁত পিষলেন মিঃ আহাদ, চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে।

❑

কে তুমি। বলো কে তুমি? আর কেনই বা আমাকে এখানে নিয়ে এলে? দস্যুরাণী কালনাগিনীর মত দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলো বললো।

তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জমকালো মূর্তি।

কুহেলি পর্বতের পাদদেশে অশ্ব রেখে পর্বতের মাঝামাঝি শৃঙ্গে জীবন্ত একটি লোককে বয়ে নিয়ে আসা কম কথা নয়। তবু যাকে বয়ে আনা হচ্ছে তার স্বইচ্ছায় তো নয়ই। জোরপূর্বক নিয়ে আসা হয়েছে, কাজেই বাহক যে রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এখনও জমকালো মূর্তির মুখের নিচের অংশ তার পাগড়ীর আঁচলে ঢাকা রয়েছে, শুধুমাত্র চোখ দুটো নজরে পড়ছিলো। গভীর নীল দীপ্ত দুটি চোখ, একজোড়া ভ্রু। দস্যুরাণীর দেহেও জমকালো ড্রেস তবে তার মাথার ক্যাপটা কোথায় খসে পড়েছে জানে না ওরা।

জমকালো মূর্তি দস্যুরাণী পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে নিজের মুখের নিচের অংশ থেকে কালো কাপড়ের আঁচল খানা সরিয়ে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে দস্যুরাণী ক্রুদ্ধভাবে উচ্চকণ্ঠে বললো—তুমি! তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ রাণীজী।

দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললো দস্যুরাণী—তুমি আমার পাতাল পুরীর অন্ধ কারাকক্ষ থেকে পালিয়ে এসেছো?

হাঁ রাণীজী।

তোমার স্পর্ধা কম নয়।

তা বটে।

দস্যু বনহুরের কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠে দস্যুরাণী, বলে সে— তুমি কিভাবে পালাতে সক্ষম হলে জানতে চাই? এত সাহস তোমার......

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দস্যু বনহুর।

দস্যুরাণীর দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে, সে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। রাগেক্ষোভে ভিতরটা যেন তার গুমড়ে উঠছিলো। সমস্ত শরীরে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অসহ্য লাগছিলো দস্যুরাণীর এত বড় অপমান। বন্দী তারই কারাকক্ষ থেকে পালিয়ে তাকে চুরি করে নিয়ে এলো, অথচ......

কি ভাবছো রাণীজী? বুঝেছি যা ভাবছো তা বলবার নয়। রাণীজী, আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি যখন আমার কারাগারে বন্দী হবে তখন যেন ভুলে না যাও আমাকে অভিবাদন জানানোর কথা......

অধর দংশন করে বললো দস্যুরাণী—চুপ করো, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

তবে এখানে কার কথা শুনবে রাণীজী? এখানে যে শুধু তুমি আর আমি। যে জায়গায় তুমি এখন দাঁড়িয়ে আছো সেটা লোকালয় নয় বা কোনো ভূগর্ভ গুহা নয়—এটা কুহেলি পর্বত। আর তুমি এখন দাঁড়িয়ে আছো কুহেলি পর্বতের মাঝামাঝি কোনো এক শৃঙ্গের গুপ্ত গুহায়।